নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

সঞ্চারিণী

ডি. এম. লাইব্রেরি
৪২, কর্নওয়ালিস স্ট্রীট · কলিকাতা — ৬

শ্রীযুক্তা দুর্গামণি দেবী
শ্রীচরণেষু

এই লেখকের অন্যান্য বই

বিদিশা

ট্রফি

কৃষ্ণপক্ষ

মহানন্দা

সম্রাট ও শ্রেষ্ঠী

মন্দ্রমুখর

সঞ্চারিণী

—এক—

'অসি-গংগকী তীর'। কোনো দুর্জন-দুরাচারী যাতে পুণ্যতীর্থ বারাণসীতে পা দিয়ে শঙ্কর-সাযুজ্য লাভ করতে না পারে, তাই গণগায়ক কালভৈরব দুই সীমান্ত রক্ষা করছেন সযত্নে। দক্ষিণ ভুজে প্রসারিত অসিধারা, বাম হাতে বারণরূপী বরুণা। মহাকালের মৌলি-শশাঙ্ক মৃত্তিকারূপে স্থিত হয়েছে ত্রিশূলশীর্ষে। 'ইরিসিপত্তন মিগদাবে'র বৌদ্ধ-সাম্রাজ্য থমকে দাঁড়িয়ে গেছে বরুণার তটসীমায়—সারঙ্গনাথ শিব তাঁর রুদ্র ক্রোধ প্রসারিত করে দিয়েছেন বেদ-বিদ্বেষী গৌতমের সেই আদি প্রচার-ভূমির ওপরে। নাস্তিক্যবাদের সেই 'মূলগন্ধকুঠিবিহার' থেকে অনেক দূরে—ঔরংজেবের উদ্ধত স্পর্ধা বেণী-মাধবের ধ্বজার ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে, দক্ষিণের এই অসি-গঙ্গার সঙ্গমে এসে সন্ত্ তুলসীদাস জীবনের শেষ দিনগুলি কাটিয়ে দিয়েছিলেন। 'রামচরিত মানসে'র শ্লোকমালার সঙ্গে তাঁর চোখের জল এখানেই গঙ্গার পবিত্র ধারাকে পবিত্রতর করে দিয়েছিল।

দশাশ্বমেধ, অহল্যাবাই ঘাট কিংবা কেদারঘাট যখন লোকে লোকারণ্য, তখন বহুদূরের এই তুলসীঘাট শান্ত নির্জনতায় আচ্ছন্ন। বছরে মেলার একটি মাত্র দিন ছাড়া প্রেমিক-সাধকের এই সাধনাশ্রমের মৌন শুচিতা আজো প্রায় অক্ষুণ্ণ। দু চারটি স্নানার্থী আসে, গঙ্গার জলের সঙ্গে প্রায় সমরৈখিক ঘাটের চবুতারায় ধ্যানস্থ হয়ে থাকে দু-একজন দণ্ডী-সন্ন্যাসী, দু-একটি ভক্ত নত-মস্তকে বাঁ দিকের উঁচু সিঁড়ি বেয়ে উঠে যায় তুলসীদাসী মন্দিরে। তা ছাড়া সারাদিন ঘাটের ওপর বটগাছটা তার নিবিড় ছায়া মেলে রাখে, এক আধটা বানর মন্থরগতিতে ঘুরে ফিরে বেড়ায়—হয়তো পাতার মর্মরে কান পেতে আজো শোনে ভক্ত তুলসীর কণ্ঠের রামগীতি।

তুলসী মন্দিরে প্রণাম করে নিচে নামতে নামতে চমকে সিঁড়ির ওপর থেমে দাঁড়ালেন অন্নপূর্ণা। স্নান সেরে দু'টি মহিলা উঠে আসছেন ওপরে।

মুখের ডৌল দেখলে বুঝতে বাকী থাকে না মা আর মেয়ে। কিন্তু অন্নপূর্ণার মুগ্ধদৃষ্টি বিশেষ ভাবে মেয়েটির ওপরেই স্থির হয়ে রইল।

তখন সকালের আলো ঝিলমিল করছে গৈরিক-গঙ্গায়। সেই আলোক-পুলকিত গঙ্গাবারির সমস্ত পবিত্রতা মেয়েটির সারা শরীরে ছড়িয়ে আছে। বছর আঠারো উনিশ বয়েস হবে। অসাধারণ সুন্দরী সে নয়, কিন্তু মুখের এমন সুকুমার নির্মলতা অন্নপূর্ণা কখনো দেখেছেন বলে মনে পড়ল না। কোমর ছাপিয়ে নেমে আসা নিবিড় কালো চুলে সূর্যের আলো পড়ে যেন একটা জ্যোতির্বলয় রচনা করে রেখেছে তার চার পাশে।

এমন লক্ষ্মীমতী কন্যা-কুমারীর রূপ যেন অন্নপূর্ণা এই প্রথম দেখলেন।

পদ্মের মতো পা ফেলে ফেলে মায়ের পেছনে মেয়েটি ওপরে উঠে অদৃশ্য হয়ে গেল। সেদিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন অন্নপূর্ণা। ভুল হয়ে গেল—বড্ড ভুল হয়ে গেল। পরিচয়টা একবার জেনে নিলে মন্দ হত না।

অন্নপূর্ণার দু-ধাপ ওপরে কাশীর বাড়ির সরকারও দাঁড়িয়ে পড়েছিল। অন্নপূর্ণা এবার ফিরে তাকালেন তার দিকে: ওদের চেনো নাকি মাধব?

মাধব বললে, ঠিক চিনি না—তবে দেখেছি। কাশীতেই থাকেন বোধ হয়।

—একবার খোঁজ নিতে পারো?

—কেন বলুন তো মা?—মাধব হাসল: দাদাবাবুর জন্যে নাকি? তা মেয়েটি কিন্তু বেশ।

—হাঁ, খাসা মেয়ে। অমন একটি বউ ঘর নিতে পারলে আমার সংসার উজ্‌লে উঠবে। খোঁজ নিয়ে দেখো তো কোথায় থাকে।

মাধব আবার হাসল: সে নেওয়া শক্ত হবে না—ওঁদের অনেকবারই আমি দেখেছি। কিন্তু মা, কী জাত, কী গোত্তর, জেনে না নিয়ে আগে থেকেই ছেলের বউ পছন্দ করে বসলেন?

অন্নপূর্ণা ভ্রুকুটি করলেন।

—সেইটেই তো তোমায় জেনে নিতে বলছি। জাতে না মিললে তো চুকে-বুকেই গেল সব। কিন্তু আমার মন যেন বলছে, এই মেয়েই আমার ঘরে আসবে।

পিছে পিছে নামতে নামতে মাধব বললে, জাতে নয় মিলল। কিন্তু যাদের মেয়ে তাদেরও তো মত না থাকতে পারে? তারাও তো আপত্তি করতে পারে?

অন্নপূর্ণার চোখ জ্বলে উঠল: কেন থাকবে না মত? আমার দীনেশ কি ফেল্‌না ছেলে? রূপে, গুণে, পয়সায় কোন্ দিক থেকে এই মেয়ের অযুগ্যি সে? তোমাকে আমি খোঁজ নিতেই বলেছি মাধব, তর্ক করতে বলিনি। যদি বামুনের মেয়ে হয়—রাঢ়ী হোক, বারেন্দ্র হোক, ঘরে আমি নেবই। তারা মত করবে কি না করবে সে দেখব আমি—তুমি নও।

ধমক খেয়ে মাধব চুপ করে গেল। কর্ত্রীর মেজাজ তার অজানা নয়; কর্তা যতদিন বেঁচে ছিলেন, তিনিও যমের মত ভয় করতেন অন্নপূর্ণাকে। যেমন স্পষ্টভাষিতা, তেমনি জেদ। তাঁর ইচ্ছা আর বিচারের বিরুদ্ধে একটা কাজও করতে সাহস পান নি পরমেশ মৈত্রেয়।

অন্নপূর্ণা বললেন, খবরটা তাড়াতাড়িই চাই আমার। দীনেশের জন্যে মনের মতো মেয়ে দেখতে দেখতেই তো দু-বছর কাটালে তোমরা। আর আমি দেরী করব না—পারলে এই অঘ্রাণেই কাজ করব। বুড়ো হয়ে যাচ্ছি—শরীরের এই অবস্থা, বেশি দিন ঠেকিয়ে রাখলে মরার আগে নাতির মুখখানাও দেখে যেতে পারব না।

মাধব থতমত খেয়ে বললে, আজ্ঞে আমি দেখছি।

কিন্তু দীনেশের বিয়ের ফুল সত্যি সত্যিই ফুটেছিল এবারে। তাই মাধবের কিছু করবার দরকারই হল না আর। পরদিন বিকেলেই আবার অন্নপূর্ণার সঙ্গে মা আর মেয়ের দেখা হয়ে গেল তিলভাণ্ডেশ্বরের মন্দিরে।

অন্নপূর্ণা ঢুকতে যাচ্ছিলেন—ওঁরা বেরিয়ে আসছিলেন মন্দির থেকে।

অন্নপূর্ণা থেমে দাঁড়ালেন। আজ সঙ্গে তাঁর ঝি ছিল, সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করল, কী হয়েছে মা?

ঝিয়ের কথার জবাব না দিয়ে অন্নপূর্ণা সোজা মহিলাকে সম্ভাষণ করলেন।

—শুনছেন?

ওঁরা থেমে পড়লেন। মুখ ফিরিয়ে ভদ্রমহিলা জানতে চাইলেন: আমাদের কিছু বলছিলেন?

অন্নপূর্ণার দৃষ্টি আবার মুগ্ধ কৌতূহলে মেয়েটির ওপরে গিয়ে পড়েছে। সেই শান্ত কমনীয় মুখশ্রী, উজ্জ্বল ললাট, দুটি ভ্রূর মাঝখানে ছোট একটি কুঙ্কুমের বিন্দু; তেমনি পিঠ ছাপিয়ে নেমে এসেছে একরাশ ঘন কালো চুলের বন্যা। পরণে বাসন্তী রঙের শাড়ী, হাতে ছোট একটি পেতলের ঘটিতে গঙ্গাজল—যেন শঙ্করকে প্রণাম করে উমা বেরিয়ে এসেছেন ভক্তিনম্র কৃতার্থতায়।

অন্নপূর্ণা জিজ্ঞাসা করলেন, এই মেয়ে আপনার?

সংযত মিষ্টি হাসি হেসে ভদ্রমহিলা মাথা নাড়লেন।

—কী নাম ওর?

—গার্গী।

—গার্গী? বাঃ, চমৎকার নামটিতো। যেমন লক্ষ্মীর মতো রূপ—নামও তেমনি।

লজ্জা পেয়ে মাথা নীচু করল মেয়েটি। সরে দাঁড়ালো দু' পা।

এর পরে কী বলবেন ঠিক করতে না পেরে ভদ্রমহিলা অস্বস্তি বোধ করছিলেন। কিন্তু অন্নপূর্ণাই আবার কথা পাড়লেন।

—আপনারা?

—ব্রাহ্মণ—বারেন্দ্রশ্রেণীর।

অন্নপূর্ণার চোখ-মুখ খুশিতে ভরে উঠল: আমরাও। মৈত্রেয়। আপনারা?

—সান্ন্যাল।

—কুলীন না কাপ?

—কাপ।

—আমরা কুলীন।—একটা রেখা অন্নপূর্ণার কপালে ফুটে উঠেই মিলিয়ে গেল: তা হোক। আজকাল ওসব ঘরে ঘরে হচ্ছে, ওতে আটকায় না।

ভদ্রমহিলা এবার স্পষ্ট গলায় হেসে উঠলেন: কী ব্যাপার, এমনভাবে কুলশীলের খোঁজ-খবর নিচ্ছেন যে? বিয়ের যুগ্যি ছেলে আছে নাকি আপনার?

—আছে বইকি—আমার একমাত্র ছেলে। রূপে, গুণে খুঁত ধরবার মতো কিছু নেই। ধর্মেও খুব মতি-গতি। তা ছাড়া—জাঁক করতে নেই, আপনাদের দশজনের আশীর্বাদে মা-লক্ষ্মীর কিছু অনুগ্রহ আছে আমার সংসারে। মেয়েটি দিন না আমাকে।

দূরে দাঁড়িয়ে রাঙা হয়ে উঠল গার্গী। ছটফট করে বললে, মা, যাবে না?

—এই যাচ্ছি—মা হাসলেন: মেয়ে লজ্জা পাচ্ছে। তা আমাদের ঘর-সংসার তো কিছুই আপনি জানেন না। শুধু মেয়ে দেখেই নিতে চাইছেন?

—অমন মেয়ে যে-ঘরে হয়, সে ঘরের খবর দরকার করে না। দেবেন বিয়ে?

—ভালো ছেলে হলে কেন দেব না? বড়সড়োও তো হয়েছে—মা বললেন, কিন্তু এখানে দাঁড়িয়ে তো কথাবার্তা হয় না দিদি। আপনারা কি কাশীতেই থাকেন?

—থাকি কলকাতায়। তবে সোনারপুরায় আমার নিজের বাড়ি রয়েছে, সেইখানেই উঠেছি। ভেবেছি আরো দিন দশেক থাকব।

—বেশ তো, ঠিকানা দিন তা হলে। গার্গীর বাবা আপনার ওখানে গিয়ে কথাবার্তা করে আসবে।

—মা, চলো—অধৈর্য গার্গী আবার ডাকল।

—যাচ্ছি—যাচ্ছি—মা হাসলেন: আর দাঁড়াতে চাইছে না। আমি চলি দিদি। ঠিকানা দিন—ওর বাবাকে পাঠিয়ে দেব এখন।

অন্নপূর্ণা বললেন, মেয়ে দেখে পছন্দ করেছি আমি—গরজ আমারি। আমিই যাব।

—তা কি হয়! আপনি ছেলের মা—

অন্নপূর্ণা বাধা দিলেন: লক্ষ্মীকে নিয়ে গিয়েই বরণ করে আনতে হয় দিদি। যাব আমিই। কোথায় থাকেন বলুন।

—শিবালয়—ভদ্র মহিলায় মুখে অপ্রতিভ হাসির রেখা দেখা দিলে: স্বামীর নাম তো করতে নেই, তা ওদিকে গিয়ে হেড্‌মাস্টার সান্ন্যাল মশাইয়ের বাড়ি বললেই লোকে চিনিয়ে দেবে। আমরা চার পুরুষ কাশীতে আছি।

বিদায় নিয়ে মা-মেয়ে টাঙ্গায় উঠে পড়লেন। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে অন্নপূর্ণা এগোলেন মন্দিরের দিকে।

অন্নপূর্ণা কাশীতে থাকেন না—নইলে যেটুকু শুনেছিলেন, তাতেই হেড্‌মাস্টার সান্ন্যাল মশাইকে তিনি চিনতে পারতেন। বিদ্যা, বিনয় এবং সহৃদয়তায় চন্দ্রশেখর সান্ন্যাল কাশীর বিশ্রুত ব্যক্তি। সেকালে দর্শন নিয়ে এম-এ পাশ করেছিলেন। কিন্তু শুধু দার্শনিকই তিনি নন; ইংরেজী, সংস্কৃত, হিন্দী আর বাংলা-সাহিত্যের প্রচুর চর্চাও তিনি করেছেন। হিন্দী আর ইংরেজী কাগজে এখনো মধ্যে মধ্যে প্রবন্ধ লেখেন তিনি—ভারতীয় দর্শন সম্বন্ধে তাঁর কিছু কিছু লেখা বিলেতের কাগজেও ছাপা হয়েছে। যৌবনে একখানা বাংলা কবিতার বই ছেপেও বের করেছিলেন, শ-খানেক উপহার দেবার পরে বাকী চারশো উইয়ে কেটেছে। সেই থেকেই ওপথ আর তিনি মাড়ান নি।

কাগজে-কলমে সাহিত্যসেবা প্রত্যক্ষভাবে বন্ধ হয়ে গেলেও মনের ভেতরে রসের সমুদ্রে ডুব দিয়েছিলেন চন্দ্রশেখর। উদীয়মান রবীন্দ্রনাথের প্রথম অভ্যুদয়কে যাঁরা সাগ্রহ বন্দনা জানিয়েছিলেন, চন্দ্রশেখর তাঁদেরই একজন। রবীন্দ্রনাথের 'ঘরে-বাইরে' নিয়ে দেশে যখন নিন্দার ঝড় উঠেছিল, তখন বইখানিকে অভিনন্দন জানিয়ে চন্দ্রশেখর অত্যন্ত উগ্র প্রবন্ধ লিখেছিলেন। সে প্রবন্ধ অবশ্য কোনো কাগজে তিনি ছাপেন নি; ছাপলে হয়তো রবীন্দ্রনাথের চাইতেও আক্রমণের আঘাতটা তাঁর ওপরেই বেশি করে এসে পড়ত।

বলা বাহুল্য, এ ধরণের লোক যে ভাবে সংসারের কাছ থেকে পালিয়ে থাকতে চায়, চন্দ্রশেখরের বেলাতেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। স্ত্রী গায়ত্রী কোনো কারণে রাগারাগি আরম্ভ করলে গভীর মনোযোগ দিয়ে পড়তে শুরু করতেন 'দেকার্তে'র দর্শন কিংবা তলিয়ে যেতেন 'স্পিনোজা'র পাতায়; ঝড় আরো উত্তাল দেখলে এমনি উঁচু গলায় 'প্যারাডাইস লস্ট' আওড়াতে সুরু করতেন যে সেই করাল শব্দতরঙ্গে থেমে যেতে বাধ্য হতেন গায়ত্রী। তারপর নিজের দুর্ভাগ্যকে ধিক্কার দিয়ে প্রার্থনা করতেন—জন্মে জন্মেও কেউ যেন পণ্ডিতের বউ না হয়।

অভিযোগটা মিথ্যে নয়। পাণ্ডিত্য বস্তুমাত্রই আত্মকেন্দ্রিক; আর আত্মকেন্দ্রিকতার সঙ্গে স্বার্থপরতা একেবারে অপরিহার্য। নিজেকে নিয়ে তন্ময় হয়ে থাকতে গেলে অবাঞ্ছিতদের জন্যে খিল দিয়েই রাখতে হয় দরজায়—জানালা বন্ধ করে ঠেকিয়ে রাখতে হয় বাইরের কলগুঞ্জন। গায়ত্রীর সংসার সেখানে মিথ্যেই মাথা কুটে মরে। মধ্যে মধ্যে সে দরজা খুলে গিয়ে ভেতরে ঢোকার সুযোগ মেলে চন্দ্রশেখরের সমধর্মী একদল ছাত্র আর বন্ধু-বান্ধবের। আসর যেদিন জমে ওঠে, সেদিন প্রমাদ গণেন গায়ত্রী। কুড়ি থেকে তিরিশ পেয়ালা চায়ের শ্রাদ্ধ তো নির্ঘাৎ; সাহিত্যতত্ত্ব বোঝাতে চন্দ্রশেখর যেদিন বেশি উত্তেজিত হয়ে পড়েন, সেদিন বেলা বারোটার সময় কড়াইশুঁটির কচুরি ভাজবার ফরমাস করাটাও তাঁর পক্ষে অতিশয় স্বাভাবিক ঘটনা।

গায়ত্রী কখনো কখনো রাগ করে বাপের বাড়ি যাওয়ার ভয় দেখান: আজই আমি গোরখপুর চলে যাব।

চন্দ্রশেখর জবাব দেন: তা যাও। কিন্তু যাওয়ার আগে কচুরি ক'খানা করে দিয়ে যেয়ো, আর কিছু বেশি করে ক্ষীরের পান্তুয়া। তোমার বিরহে বিকল্প তো কিছু চাই।

চন্দ্রশেখর ঔদারিক নন; যা খান, খাওয়ার বড়াই করেন তার চাইতে অনেক বেশি। আর গায়ত্রীর আশ্চর্য দুর্বলতা আছে খাবার করা সম্বন্ধে। তাই

চন্দ্রশেখর যখন ক্ষীরের পান্তুয়ার উল্লেখ করেন তখন মনে মনে প্রসন্ন না হয়ে থাকতে পারেন না গায়ত্রী।

—আমি পারব না ওসব করতে। ইচ্ছে হয় কচুরি গলি থেকে আনিয়ে খেয়ো— ঝঙ্কার দিয়ে গায়ত্রী চলে যান। বাপের বাড়ী আর যাওয়া হয় না— কিন্তু বিকেলেই বসে যান ক্ষীরের পান্তুয়ার আয়োজন নিয়ে। আর সেই সঙ্গে এও জানেন, সন্ধ্যের পরে একদল অপোগণ্ড জুটিয়ে এনে তাদের দিয়েই চন্দ্রশেখর ওগুলো সাবাড় করাবেন।

এতেও গায়ত্রীর খুব বেশি আপত্তি ছিল না। পণ্ডিতের স্ত্রী হওয়ার দুর্ভাগ্যকে মানিয়েও নিয়েছিলেন এক রকম করে। কিন্তু দিনের পর দিন চন্দ্রশেখর যে ভাবে গার্গীকে প্রশ্রয় দিচ্ছেন, তাতেই তাঁর সারা গা একেবারে জ্বালা করে ওঠে।

মেয়ের নাম দিয়েছেন গার্গী। গার্গীর মতো তাকে একেবার ব্রহ্মবাদিনী করে তুলবেন এই তাঁর সংকল্প। মেয়েকে তিনি স্কুলে দেননি। গায়ত্রীর বার বার অনুরোধ সত্বেও নয়। বলেছেন, ময়রা সন্দেশ খায় না কেন জানো?

গায়ত্রী বলেছেন, না!

চন্দ্রশেখর বলেছেন, আমি জানি। কারণ সে বস্তু নিজের পেটে দেবার মতো নির্বোধ সে নয়।

—বুঝলাম। কিন্তু ইস্কুলে দেবার সঙ্গে এর সম্পর্ক কী?

—অত্যন্ত সহজ। আমি নিজেই একটা স্কুলের হেডমাস্টার। বিদ্যা যেখানে বিক্রি হয়, জ্ঞান সেখান থেকে পালাতে পথ পায় না। ছাত্রজীবনে নিজেই যথেষ্ট ঠকেছি আমি—মেয়েটাকে আর নতুন করে ঠকাতে চাই না।

—কিন্তু পৃথিবীশুদ্ধ সমস্ত লোকই তো ইস্কুলে পড়ে মানুষ হচ্ছে।

—মানুষ হচ্ছে? চন্দ্রশেখর হেসে জবাব দিয়েছেন: ও কথাটায় কিছু আপত্তি আছে আমার। কিন্তু যাক সে সব। আমার বক্তব্য হল, ময়রার দোকানের খাবার খেয়ে অজীর্ণই হয়—শরীর পুষ্টি পায় না।

—যত বাজে কথা তোমার—গায়ত্রী বিরক্ত হয়ে উঠেছেন।

—বাজে কথা?—নাটকীয় ভঙ্গিতে চন্দ্রশেখর বলেছেন, হায় নারী, অন্তঃপুরের হাঁড়ি-সরা নিয়ে সুখে দিন কাটাচ্ছো, সংসারের জটিল রহস্য কিছুই বোঝো না। বিস্তার অম্লশূলে ভুগছে এমন রোগী প্রায়ই আমার কাছে আসে। আমার মেয়ের সে দুর্ভাগ্য আর ঘটতে দেব না।

—তা হলে লেখাপড়া ওকে শেখাবে না নাকি?

—শেখাব। নিজে পড়াব। অনেককেই তো পড়িয়েছি, মনের মতো ছাত্র পেলাম না একটাও। ওকে আমি প্রাণ ভরে গড়ে তুলবার চেষ্টা করব।

—তা হলেই ওর মাথাটা একেবারে খেয়ে দিতে পারবে—গায়ত্রী এবারে চটে উঠেছেন।

কিন্তু চন্দ্রশেখর আর জবাব দেননি। তাঁকে মোটা একখানা ফিলসফির বইয়ের দিকে হাত বাড়াতে দেখে মানে মানে গায়ত্রী নিজেই সরে গেছেন সামনে থেকে।

কিন্তু মেয়ের মাথাটি যে তিনি বিলক্ষণ চিবিয়ে দিয়েছেন, এ সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই গায়ত্রীর মনে। শুধু রাত দিন মোটা মোটা বই পড়িয়েছেন তাই নয়, মেয়ের মধ্যেও সঞ্চার করেছেন সাহিত্যের নেশা; পশ্চিম আর কলকাতার দু-একখানা বাংলা কাগজে আজকাল এক আধটা গল্প কবিতা লিখছে গার্গী—কয়েকটা পুরস্কারও পেয়েছে কোথায় কোথায় প্রবন্ধ-প্রতিযোগিতায়।

গায়ত্রীর তাতে গর্ববোধ হয়নি তা নয়, কিন্তু আতঙ্ক জেগেছে তার চাইতেও বেশি। মেয়ে বিদুষী হচ্ছে—আনন্দের কথা সন্দেহ নেই; কিন্তু খালি লেখাপড়া শিখলেই তো চলবে না। সংসার করতে হবে পরের ঘরে গিয়ে, মানিয়ে চলতে হবে তাদের সঙ্গে। সেখানে কেউ সামনে বইয়ের পাহাড় খাড়া করে দিয়ে মেয়েকে আড়াল করে রাখবে না; নানা দায় আছে, হাজার দায়িত্ব আছে। সেগুলোও তো শেখা দরকার।

চন্দ্রশেখর শুনে বলেছেন, অত ঝামেলা তুলো না। যারা ওভাবে পাঁচ রকম বায়নকা করবে, তাদের ঘরে মেয়ে আমি দেবই না।

—মেয়ের বাপের অত তেজ! ও তেজ সয়ে কে নিতে যাচ্ছে তোমার মেয়েকে!

—যার গরজ পড়বে, সে নিজেই ছুটে আসবে দেখো।

পণ্ডিত স্বামীকে শ্রদ্ধা করতেন গায়ত্রী, কিন্তু তিনি যে এমন ভাবে ভবিষ্যদ্বাণী করবার শক্তিও রাখেন—তাঁর এই অলৌকিক ক্ষমতার ব্যাপারটা কল্পনাতীত ছিল বইকি! বাড়ির পথে ফিরতে ফিরতে বিস্মিতা গায়ত্রী সেই কথাই ভাবছিলেন। উপযাচিকা হয়েই এসেছেন অন্নপূর্ণা—পাত্রীপক্ষের চাইতে গরজটা তাঁরি যেন দশগুণ বেশি। গায়ত্রী আড়চোখে একবার মেয়ের দিকে তাকিয়ে দেখলেন। টাঙ্গায় তাঁরি পাশে লজ্জানত স্নিগ্ধ মুখে বসে আছে গার্গী। হঠাৎ মাতৃগর্বে গায়ত্রীর সমস্ত দেহমন যেন পুলকিত হয়ে উঠল। সত্যিই চন্দ্রশেখর ভুল করেন নি। যার একটু চোখ আছে, সেই-ই তাঁর মেয়েকে আদর করে ঘরে নিয়ে যেতে চাইবে।

গায়ত্রী সস্নেহে বললেন, এবার বোধ হয় তোকে আর রাখতে পারব না মা। পাঠাতেই হবে পরের ঘরে।

গার্গী তর্জন করে বললে, মা, চুপ করো।

—চুপ করব কেন?—গায়ত্রী হাসলেন: তোকে ওঁর তো খুব পছন্দ হয়েছে।

—ওসব যা-তা বোলো না। আমি কি গোরু না ছাগল? যার খুশি সে এসে পছন্দ করে যাবে?

গায়ত্রী ভ্রূকুটি করলেন।

—আদর দিয়ে দিয়ে উনি তোকে মাথায় তুলেছেন। একেবারে মুখে আর কিছু আটকায় না। ভালো সম্বন্ধ যদি হয়—

—ওসব চেষ্টা করো না মা। বিয়ে আমি করব না।

—বিয়ে করবি না?—গায়ত্রী ধমক দিয়ে উঠলেন, বাপের শেখানো বুলি কপচানো হচ্ছে বুঝি? ও-সমস্ত পাকামি চলবে না। আঠারো উনিশ বছর বয়েস হল, আর তোমায় আমি থুবড়ো করে ঘরে রাখব না এ স্পষ্ট বলে

দিলাম।—গায়ত্রী গজগজ করতে লাগলেন: তোমাদের বাপ-মেয়ের উৎপাত অনেক আমি সহ্য করেছি, এবারে আর কিছুতেই সইব না তা জেনে রেখো।

টাঙ্গা এসে শিবালয়ের বাড়ির সামনে থামল।

—দুই—

এমনও হতে পারত: বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি রত্ন হয়ে বেরিয়ে আসত দীনেশ; চোখ বুজে আই-সি-এস না হোক, বি-সি-এস হয়েও বেরিয়ে আসত সগৌরবে। একটা নামী চাকরীর দামী পদমর্যাদায় উজ্জ্বল করে তুলত আত্মীয়-স্বজনদের মুখ। উঠতে বসতে সেলাম পেত, বড় বড় সাহেবদের ডিনারে তার জন্যে একখানা চেয়ার আর কার্ড আঁটা টেবিল পাতা থাকত, পরিণামে বাড়ীর নেম্ প্লেটে বেশ বড় বড় হরফের আত্মপ্রসাদে ঘোষণা করতে পারত: রায় ডি, সি, মৈত্র বাহাদুর। রিটায়ার্ড অমুক এবং অমুক এবং অমুক—।

এসব নিশ্চয়ই হতে পারত দীনেশ। অন্তত জাতকের কোষ্ঠী যিনি তৈরী করেছিলেন, সেই বামাপ্রসন্ন জ্যোতিঃশাস্ত্রী এমনি একটা ভবিষ্যদ্বাণীই রেখে গিয়েছিলেন দীনেশের জন্ম-পত্রিকায়। কিন্তু গ্রহ-নক্ষত্রের কোন্ খামখেয়ালীতে কে জানে—সরস্বতীর সঙ্গে সম্পর্কটা বেশিদিন দীনেশ রাখতে পারল না। এন্ট্রান্সের রুদ্ধ দরজায় বার দুই ব্যর্থ চেষ্টায় ঘা দিয়ে হলেও-হতে-পারত আই-সি-এস বড়বাজারের লোহার দোকানে গিয়ে জাঁকিয়ে বসল।

ব্যবসাটা পৈতৃক। বাপ অবশ্য কর্মচারীদের ওপর বরাত দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকতেন, দিনান্তে একবার গিয়ে তাড়াহুড়ো করে ক্যাশ মেলাতেন, এবং অবশিষ্ট সময় জমিয়ে বসে থাকতেন গান আর দাবার আড্ডা।

তবু যে ব্যবসাটা ডোবেনি, তার কারণ লোহার মতো নিরেট জিনিষকে হজম করা বোধ হয় সাধারণ কর্মচারীর পাকস্থলীর কাজ নয়। পাঞ্জাবের কয়েকটা বাঁধা পার্টির সঙ্গে যান্ত্রিক নিয়মে কাজ-কারবার চলত—লাভও নেই,

ক্ষতিও নেই—এমনি একটা অ্যাপেণ্ডিক্সের মতোই সংসারের গায়ে সংলগ্ন হয়েছিল ব্যবসাটা।

সুতরাং ব্যবসা একটা থাকলেও ঠিক ব্যবসায়ীর ঘরে জন্মায় নি দীনেশ। কলকাতায় খান আষ্টেক বাড়ীর ভাড়া নিয়ে তারও দিন কাটতে পারত—আই-সি-এস না হলেও বাইরের বৈঠকখানায় দাবার ছক পেতে বসাই ছিল স্বাভাবিক তার পক্ষে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত লোহাই তাকে টানল। অথবা নানা ধাতুতে মানুষ তৈরী এমনি একটা প্রবাদ মেনে নিলে বলা যেতে পারত, চুম্বকের মতো দীনেশই টানল লোহাকে।

অতএব সরকারী কর্মচারীর টাই-ট্রাউজার পরল না দীনেশ, বনেদী জমিদারের গিলে-করা পাঞ্জাবীও না। চব্বিশ বছরেই ছোট ছোট করে চুল ছাঁটল, গায়ে পরল ফতুয়া আর কোমরে বাঁধল শব্দমুখর চাবির তোড়া। তারপর ফটাস ফটাস করে চটিজুতো টানতে টানতে লোহার দোকানে গিয়ে উবু হয়ে বসল ক্যাশবাক্সের সামনে। তার সমবয়েসী বন্ধুরা যখন ছ্যাকড়া গাড়ীতে করে ঘোমটা টানা বউকে নিয়ে থিয়েটার দেখতে চলল, দীনেশ তখন বিনিদ্র রাতের জ্বালাধরা চোখ নিয়ে হন্দর হন্দর ইস্পাতের হিসেব করতে লাগল খেরোর খাতায়।

অন্নপূর্ণা কয়েকবারই জিজ্ঞেস করেছিলেন, কিরে, বিয়ে করবিনে?

দীনেশ বলেছিল, হবে এখন। বাজারে আজকাল ঘন ঘন তেজী-মন্দী চলছে—ওসব ভাববার সময় নেই মা।

এই সময় প্রথম মহাযুদ্ধ বাধল। আর সেই স্পর্শমণির ছোঁয়া লেগে টন টন লোহা হয়ে গেল ভারে ভারে সোনা। তিন পুরুষ জমিদারী করে পূর্ব-পুরুষ যা ভাবতেও পারেনি, মাত্র পাঁচ বছরেই তাই করে বসল দীনেশ। মরচে পড়া লোহাও যে টাকার খনি—এই সত্যই হাতে কলমে প্রমাণ করে দিলে সে।

টাকা বাড়ল অনেক, কিন্তু চাল একটুও বাড়াল না দীনেশ। রইল সেই ফতুয়া, সেই চাবির তোড়া, সেই চটাস চটাস চটি। কিন্তু এরই মধ্যে

একটুখানি ব্যতিক্রম ঘটে গেল একদা—বড়বাজারের লোহা-লকড়ে ঠাসা সংকীর্ণ গলিটার ভেতরে কখন পথ হারিয়ে এক ঝলক বসন্তের বাতাস বয়ে গেল।

বউভাতের নিমন্ত্রণ করলে এক সমব্যবসায়ী বন্ধু। অনেক ভেবে-চিন্তে 'সতী সাবিত্রী হও' লেখা একখানা সোনা-বাঁধানো চিরুনি নিয়ে দীনেশ বউ দেখতে গেল। বেনারসীর অবগুণ্ঠন সরিয়ে নববধূ যখন দীনেশের দিকে তাকিয়েই লজ্জারক্ত মুখখানি নামিয়ে নিলে, সেই মুহূর্তেই লৌহনিষ্ঠ দীনেশ অনুভব করলে, তারও মনের ভেতরে কখন একটুখানি ফাঁকা তৈরি হয়ে গেছে।

মনের ব্লাস্ট্ ফার্নেসে আজ লোহার তাল গলে গিয়ে বইতে লাগল তরল ধারায়; পথ দিয়ে বাড়ী ফিরতে ফিরতে আজ সে জানতে পারল চাঁদের আলোটাকেও কখনো কখনো মন্দ লাগে না; হাওয়াটাও ভারী মিষ্টি ঠেকল গায়ে। শেফিল্ড ইস্পাতের নামতা আওড়ানো নয়—দীনেশের কেন যেন গান গাইতে ইচ্ছে করল। কোথায় শোনা একটা গানের কলি সে বেসুরো গলায় গুন্‌গুন্ করতে লাগল: 'ওই মহাসিন্ধুর ওপার হতে কী সঙ্গীত ভেসে আসে—'

গানটা আধ্যাত্মিক—কিন্তু প্রেরণাটা অন্য জাতের। কাজেই ভাবার্থের দিকে ভ্রূক্ষেপ না করে, দীনেশ সুর চড়িয়ে ধরল: 'ওরে আয়রে হেথা আয়রে তোরা—যেথা নাইকো মৃত্যু, নাইকো জরা'—

সঙ্গে সঙ্গেই অবশ্য কেউ কাছে এল না। বরং কাছে যে ছিল—অর্থাৎ ডাস্ট্‌বিনের পাশে একটা কুকুর—সে ঊর্ধ্বশ্বাসে পালিয়ে গেল।

দীনেশের মন কিন্তু বলতে লাগল, সত্যিই কেউ এলে বড় ভালো হত। সত্যিই কারুর আসা এখন বড্ড দরকার।

এরই দিন কয়েক বাদে সকালে উঠেই অন্নপূর্ণা গজ গজ করতে লাগলেন।

—এই যে কাশী চলেছি, আর আমি ফিরব না।

রাতে একটু সর্দিজ্বর হয়েছিল, তাই সবে এক পেয়ালা আদা-চা খেয়ে গলায় ধুসো একটা কম্‌ফর্টার জড়াচ্ছিল দীনেশ। কানটাকে ভালো করে জড়িয়ে ফেলার আগেই মার কথা তার কানে গিয়ে আঘাত করলে।

—কী হয়েছে মা? হঠাৎ এমন কড়া প্রতিজ্ঞা কেন?

—প্রতিজ্ঞা আবার কী!—অন্নপূর্ণার স্বরে এবার উদাস বৈরাগ্য ফুটে বেরুল: কী নিয়ে সংসারে আমি থাকব, থাকবই বা কিসের সুখে? ছেলে আমার লোহা কামড়ে পড়ে আছে—এতবড় লক্ষ্মীর পুরী দিনরাত যেন খাঁ খাঁ করে। এর ভেতরে কারুর মন টেঁকে? তার চাইতে বিশ্বনাথের পা জড়িয়ে পড়ে থাকলে মনে শান্তি পাব।

দীনেশ আস্তে আস্তে গলা থেকে কম্‌ফর্টারটা খুলে আনল। গলার বদলে জড়াতে লাগল বাঁ-হাত।

—কী করতে বলো তুমি?

—নতুন করে আবার বলার আছে কী?—অন্নপূর্ণা এবারে ঝঙ্কার দিলেন: বলে বলে আমার মুখ তো পচিয়ে ফেলেছি। বিয়ে যখন তুই করবিইনে, তখন এই ফাঁকা সংসার আঁকড়ে থাকার কোন্ দায়টা পড়েছে আমার? মাসে মাসে দু-দশটা টাকা মাসোহারা পাঠিয়ে দিস্ বাবা, কাশীতে একটা বিধবার ওতেই স্বচ্ছন্দে চলে যাবে।

দর-দামের ব্যাপারে অভিমানী পার্টির যেমন করে মান ভাঙাতে হয়, সেই পদ্ধতিতেই বেশ একটা মোলায়েম হাসি হাসল দীনেশ। পরিশীলিত, অভ্যস্ত হাসি।

—বউ ঘরে আনতে চাও তো আনো না মা। কে বারণ করছে?

চমকে উঠলেন অন্নপূর্ণা। যেন ভূতের হাঁচি শুনলেন।

—কী বলছিস তুই? হাঁ রে, সত্যিই তুই বিয়ে করবি?

মাফলারটা ফেলে দীনেশ বিদ্যুৎবেগে একটা ম্যাঙ্কি ক্যাপ চড়িয়ে ফেলল মাথায়। তারপর দ্রুত গতিতে বেরিয়ে যেতে যেতে জানিয়ে গেল, তাই তো বললাম।

বার্থ রিজার্ভ করা হয়ে গেছে, কাশী যাওয়ার ব্যাপারটা স্থগিত রাখা যায় না। তাই তিন দিন পরেই তিনি কাশীর গাড়ি ধরলেন। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করে গেলেন, ফিরে এসেই তিনি দীনেশের বিয়ের ব্যবস্থা পাকা করে

ফেলবেন। আর বাবা বিশ্বেশ্বরের যদি অনুগ্রহ হয়, তাহলে কাশীতেই যে মনের মতো একটি বউ জুটে যাবে না, এমন কথাই বা কে বলতে পারে ?

দেখা গেল, কাশী-বিশ্বনাথ অন্তর্যামী। তাই সকালের এক প্রসন্ন উজ্জ্বল আলোয় অসি-গঙ্গার পুণ্য-সঙ্গমে তুলসীঘাটের ওপারে আবির্ভূত হল কুমারী গার্গী।

তিলভাণ্ডেশ্বরের মন্দিরে দেখা হওয়ার পরে সে রাত্রে আর অন্নপূর্ণার চোখে ঘুম এল না। পরদিন সকালেই সরকারকে নিয়ে তিনি টাঙ্গা করে হেড মাস্টার সান্ন্যাল মশাইয়ের বাড়ীর দিকে রওনা হলেন। আর ঠিক সেই মুহূর্তেই দোকানের কুলুঙ্গিতে সিদ্ধিদাতা গণেশের পায়ে দৈনিক বরাদ্দ সন্দেশটি নিবেদন করলে দীনেশ—বিড় বিড় করে আওড়ালে অস্পষ্ট কী কতগুলো মন্ত্র।

সেই সময়ে চারশো মাইল দূরের কাশীতে গায়ত্রী গার্গীকে লক্ষ্য করে ঝামটা মারলেন একটা।

—বিয়ে করবি কি করবি নে, সে কথায় তোর কাজ কী! তোর ভালোমন্দ আমরাই বুঝব।

মাঝখান থেকে চন্দ্রশেখরের স্পিনোজা মাঠে মারা গেল। বিরক্তিভরে বইটা ঠেলে সরিয়ে দিয়ে বললেন, সকাল থেকেই অমন বীররস দিয়ে আরম্ভ করলে—ব্যাপারটা কী ?

গায়ত্রী সরোষে বললেন, প্রশ্রয় দিয়েই ওর মাথাটা তুমি খেলে। যেচে এমন সম্বন্ধ এসেছে, স্বেচ্ছায় যদি হারাও তা হলে পরে মনস্তাপের আর পার থাকবে না বলে দিলাম।

চন্দ্রশেখর বললেন, তা বটে। কিন্তু এমন সম্বন্ধটা কী কারণে অসামান্য সেটা এখনো ভালো করে জানা যায়নি।

গায়ত্রী বললেন, লক্ষ্মীমন্ত ঘরের বউ—দেখলেই চেনা যায়। তা'ছাড়া যেমন মিষ্টি কথাবার্তা—তেমনি ভদ্র ব্যবহার। ভালো সংসার না হলে অমন হয় ?

চন্দ্রশেখর মাথা চুলকোলেন: তা হতে পারে। কিন্তু মেয়ের বিয়ে তো আর সে ভদ্রমহিলার সঙ্গে হবে না—হবে তাঁর ছেলের সঙ্গে। সেটি যে কী বস্তু—

গায়ত্রী বাধা দিলেন: তোমার মেয়ের চাইতে কোনো অংশে খারাপ বস্তু হবে না তা জেনে রেখো।

চন্দ্রশেখর বললেন, কী আশ্চর্য! তোমার দেখি আজকাল দিব্য দৃষ্টি খুলছে! কিন্তু একটা কথা বলি। সংসার ভালো হলেই যে ছেলে সাক্ষাৎ হীরের টুকরোটি হবে—শাস্ত্রে এমন লেখেনা। বরং বেশির ভাগ ক্ষেত্রে উল্‌টোটাই দেখা যায়! তার চাইতে যাক্ না আর কিছু দিন—মেয়ে আর একটু বড় হোক—

—বড় হোক!—গায়ত্রী বললেন, আর কত বড় হবে? বেণীমাধবের ধ্বজা ছাড়িয়ে উঠবে নাকি মাথা? বিয়ে দিলে কবে এতদিন—

চন্দ্রশেখর বললেন, থাক থাক, বাক্যটা ওই পর্যন্তই অসম্পূর্ণ রাখো। আমার বলবার কথা হল, মেয়ে এমন গলগ্রহ হয়নি যে, এখুনি তাকে কাশীর গঙ্গায় বিসর্জন না দিলেই চলছে না।

ঝগড়া করবার জন্য গায়ত্রী মনে মনে গাছকোমর বাঁধলেন। কত তীব্র ভাষায় আক্রমণটা প্রথমে শুরু করবেন সেই কথাই ভাবছেন, ঠিক এমনি সময় ঘটনাস্থলে চাকর এসে দাঁড়ালো।

—টাঙ্গায় করে এক বিধবা মাইজী এসেছেন। বাবুর সঙ্গে দেখা করবেন।

—কি রকম মাইজী রে?—গায়ত্রী তটস্থ হয়ে উঠলেন: গলায় সোনার হার, চোখে চশমা, গোরা রং?

—জী হাঁ।

—ওঁরা এসে পড়েছেন—ঘর থেকে প্রায় উড়ে বেরিয়ে গেলেন গায়ত্রী। এতক্ষণের নির্বাক শ্রোত্রী গার্গী সোজা পলায়ন করলে ছাদের দিকে। আর চন্দ্রশেখর 'ন যযৌ ন তস্থৌ' অবস্থায় আবার নতুন করে 'স্পিনোজা'র পাতা খুলবেন কিনা চিন্তা করতে লাগলেন।

কিন্তু বেশিক্ষণ তাঁকে অপেক্ষা করতে হল না। মিনিট দুয়েকের মধ্যেই গায়ত্রীর পেছনে অন্নপূর্ণা এসে ঢুকলেন ঘরে।

—আসুন—আসুন—সসম্ভ্রমে অভ্যর্থনা করলেন চন্দ্রশেখর।

খাটের একপাশে বেশ পাকাপাকিভাবেই অন্নপূর্ণা জাঁকিয়ে বসলেন। তারপর সৌজন্য-বিনিময়ের পর্ব শেষ হতে না হতেই বিনা ভূমিকায় বলে বসলেন, আপনার মেয়েটিকে আমি নিতে চাই।

চন্দ্রশেখর সবিনয়ে হাসলেন : আমার মেয়ে কি আপনার সংসারের যোগ্য হবে?

অন্নপূর্ণা বললেন, আমার সংসার উজ্জ্বল করে দেবে সান্ন্যাল মশাই। অমন সুলক্ষণা মেয়ে আপনার—ওকে ঘরে নিতে পারা তো আমারই ভাগ্যের কথা!

বিহ্বল হয়ে গেলেন চন্দ্রশেখর। যেচে কন্যা নিতে আশার ঘটনা হয়তো নতুন নয়, কিন্তু মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছে অন্নপূর্ণার উচ্ছ্বাস। কখনো এমন শুনেছেন বলেও তাঁর মনে পড়ল না। অসীম বিস্ময়ে চন্দ্রশেখর ভাবতে লাগলেন, নিজের মেয়ে যে এমন আশ্চর্য সুলক্ষণা, এমন অপরূপ কল্যাণশ্রী যে তার সর্বাঙ্গে, এই সত্যটা এতদিন তাঁরই চোখে ধরা দেয়নি কেন?

আর আনন্দে গায়ত্রীর চোখ জলজল করতে লাগল।

চন্দ্রশেখর বার কয়েক থতমত খেলেন। তারপর জিজ্ঞেস করলেন, কিন্তু ছেলেটি—

অন্নপূর্ণা বললেন, একমাত্র ছেলে আমার। স্বভাবে চরিত্রে অমন ছেলে এ-যুগে আর দুটি পাবেন না এ আমি হলফ করেই বলতে পারি। কলকাতায় আমাদের আটদশখানা বাড়ী, তার ওপর লোহার কারবার। ছেলে সেই কারবারই দেখাশোনা করে। হয়তো এ-কালের ছেলের মতো চালবাজী জানে না, কিন্তু একেবারে খাঁটি মানুষ—এ সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন আপনি।

পুত্রগর্বে অন্নপূর্ণার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

আর, খাঁটি মানুষ দীনেশ সেই সময়ে অত্যন্ত উত্তেজিত ভাবে একটা কিল মারল ফরাসের গায়ে।

—মেয়েমানুষের অত বাড় ভালো নয়, এ তোমায় বলে দিচ্ছি মন্মথ। একদিন পস্তাবে—জেনে রেখো।

বন্ধু মন্মথ দাশগুপ্ত ওকালতী পাশ করে হাইকোর্টে ঢুকেছে। একটা সিগারেট ধরিয়ে একটুখানি হাসল।

—তোমার মতো বেরসিকের সঙ্গে কথা কওয়াও বিপদ দেখছি। আরে, এক-আধটু দাম্পত্য কলহ না জমলে কি আর গৃহধর্ম করে সুখ আছে?

—দাম্পত্য-কলহ!—দীনেশ আরো উত্তেজিত হয়ে উঠল: তাই বলে তোমার বিনা-হুকুমে বাপের বাড়ি চলে যাবে? ঘরের বউয়ের রাস্তায় বেরুবার মতো এত সাহস আসে কোত্থেকে?

মন্মথ দাশগুপ্ত মুখের চারদিকে ধোঁয়ার কুহেলি রচনা করতে লাগল: ও যে বেথুন স্কুল থেকে পাশ করেছে ভাই। রাস্তায় একা একা বেরুবার ভরসা ওদের আছে।

—ইস্কুলে পড়েছে!—দীনেশ কিছুক্ষণ স্তম্ভিত চোখে তাকিয়ে রইল: এই মরেছে! ইস্কুলের-পাশ করা মেয়ে বিয়ে করেছ তুমি? নিজের পায়ে নিজে কুড়ুল মেরেছ?

—ইস্কুলে-পড়া মেয়ে সম্বন্ধে এমন বিভীষিকা কেন তোমার?—সকৌতুকে মন্মথ জিজ্ঞাসা করলে।

—লেখাপড়া-জানা মেয়েরা স্বাধীন হয়ে ওঠে। স্বামীকে শ্রদ্ধা করতে পারে না, সংসারে অশান্তি ঘটায়। মেয়েরা বড়জোর একটুখানি নাম দস্তখত করতে পারলেই যথেষ্ট—গম্ভীর গলায় নিজের সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিলে দীনেশ।

একটু চুপ করে থেকে মন্মথ বললে, লোহার ব্যাবসা করে তুমি যে কত নীরেট হয়ে যাচ্ছ, তা তুমি নিজেই জানো না দীনেশ। তোমার মতামতগুলো শুনলে মনে হয়, যেন তুমি মনু-পরাশরের যুগেই ফিরে যাচ্ছ!

অবশ্য মনু-পরাশরের যুগে স্ত্রী-শিক্ষা অনেক বেশিই ছিল—চন্দ্রশেখর

এখানে উপস্থিত থাকলে এমনি একটা জবাব তিনিই দিতেন। কিন্তু মন্মথ সে কথা ভাবল না, দীনেশও না।

দীনেশ বললে, নীরেটই আমি থাকতে চাই। তোমাদের মতো পুঁথিপড়া বিদ্বান হয়ে পণ্ডিত বউ আমি ঘরে আনতে চাই না। আমার বউ সংসার দেখবে, নাটক নভেল নিয়ে বিছানায় পড়েও থাকবে না, কিংবা তেজ করে বাড়ি থেকে বেরিয়েও যাবে না।

আশীর্বাদের কৃত্রিম ভঙ্গিতে মন্মথ বললে, করুণাময় তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করুন।

কঠিন চোখে দীনেশ মন্মথের দিকে তাকালো।

আর ঠিক তখনই চন্দ্রশেখরের শিবালয়ের বাড়ি থেকে বেরিয়ে মাধব সরকারের সঙ্গে টাঙ্গায় উঠলেন অন্নপূর্ণা। দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে রইলেন চন্দ্রশেখর আর গায়ত্রী।

অন্নপূর্ণা বললেন, তা হলে ওই কথাই রইল সান্ন্যালমশাই। যদি প্রজাপতির অনুগ্রহ হয়, তা হলে আসছে মাসেই দিন ঠিক করে ফেলব। আমি আজই কলকাতায় চিঠি লিখে দিচ্ছি দীনেশকে।

চন্দ্রশেখর কিছু একটা বলবার আগে দ্বিধা করতে লাগলেন। কিন্তু তাঁর মুখের কথা কেড়ে নিলেন গায়ত্রী-ই।

—তাড়া আমাদেরও আছে দিদি! কতদিন আর মেয়েটাকে ঘরে ফেলে রাখব?

—ফেলে রাখবার মতো মেয়ে আপনার নয়। পাছে আর কেউ কেড়ে নিয়ে যায়, তাই আগে-ভাগেই তুলে নিতে এসেছি—অন্নপূর্ণা সস্নেহে হাসলেন: তা হলে আজ আসি, কেমন?

দুহাত তুলে নমস্কার জানালেন অন্নপূর্ণা, প্রতি-নমস্কার করলেন গায়ত্রী আর চন্দ্রশেখর। টাঙ্গা চলতে শুরু করল।

তখন, বুক পকেটের ঘড়িটা দেখে দীনেশের দোকান থেকে রাস্তায় নামল

মন্মথ। বললে, যাই ভাই, কোর্টের বেলা হয়ে যাচ্ছে। ওখান থেকে আবার বউয়ের মান ভাঙাতে যেতে হবে ভবানীপুরে।

দীনেশ চাপা গর্জন করে বললে, মেনিমুখো!

মন্মথ হাসল, জবাব দিলে না। দ্রুত হাঁটতে শুরু করলে।

আর নিজের ঘরের ইজি চেয়ারটায় তন্ময় হয়ে বসে থাকা চন্দ্রশেখরের ঠিক পেছনে এসে দাঁড়ালো গার্গী। দাঁড়ালো সভয়ে, সীমাহীন কুণ্ঠার সঙ্গে।

মুখ তুলে ক্লান্তভাবে হাসলেন চন্দ্রশেখর : কী মা?

—তুমি যে এখন আমাকে রবীন্দ্রনাথ পড়াবে বলেছিলে বাবা।

—বলেছিলাম নাকি?—জোর করে চন্দ্রশেখর সহজ হতে চেষ্টা করলেন : বেশ, বই নিয়ে আয় তা হলে।

—তিন—

কিন্তু চন্দ্রশেখর আর গার্গীর রবীন্দ্রকাব্যপাঠের ওপর এইখানেই যবনিকা পড়ল।

গায়ত্রী বললেন, আর কথা নেই। মনঃস্থির আমি করে ফেলেছি—বিয়ে এখানেই হবে।

চন্দ্রশেখর ক্লান্তভাবে হাসলেন: কথাটা উলটো বললে। এখানে বিয়ে দেবার জন্তেই তুমি আগে থেকে নিজের কোমর বেঁধেছ, মনঃস্থির করেছ তারপর।

—মানে?—গায়ত্রী বুঝতে পারলেন না।

চন্দ্রশেখর বললেন, এটা স্পিনোজার থিয়োরী—ওর মানে বোঝাতে গেলে অনেক বড় একটা বক্তৃতা দিতে হয়। সোজা কথাটা এই যে, স্পিনোজা তোমাকে দেখলে বলতেন, সিদ্ধান্তটা থেকে তোমার ইচ্ছাটা আসেনি, ইচ্ছাকেই তুমি সিদ্ধান্তের ঘাড়ে চাপিয়েছ। অর্থাৎ আরো পরিষ্কার করে বোঝাতে গেলে—

গায়ত্রী রেগে উঠে বাধা দিলেন: থাক, থাক, চুপ করো। ওসব বড় বড় বুলি আমি শুনতে চাই না—ও তোমার ছাত্রদের জন্তেই তোলা থাক। শুধু একটা কথার স্পষ্ট জবাব দাও, এ বিয়েয় তোমার আপত্তি আছে?

—আপত্তি না করার জন্তেও খানিকটা ভেবে নেওয়া দরকার। সে সুযোগও তো তুমি দিচ্ছ না!

গায়ত্রী গম্ভীর মুখে বললেন, তবে তোমার যা খুশি তাই করো। তোমাদের বাপ মেয়ের ব্যাপারে আমাকে আর জড়িয়োনা।

গায়ত্রী নাটকীয় ভাবে প্রস্থান করলেন।

দিন কয়েক বিমর্ষ হয়ে বসে রইলেন চন্দ্রশেখর—তর্ক করলেন নিজের মনের সঙ্গে। তারপর ক্রমশ তাঁর মনে হল, এতদিন যে মেয়ের বিয়ে দেননি,

সে তো তাঁর স্বার্থপরতা ছাড়া কিছুই নয়। একমাত্র মেয়েকে চোখের আড়াল করার দুঃখটা এড়াবার জন্যেই তিনি তাকে জোর করে ধরে রাখতে চাইছেন। কিন্তু আজ তাকে নিজের সংসার বুঝে নিতে দেওয়া উচিত। অতএব—

অতএব এরই মাস দেড়েক পরে একদিন বরের টোপর মাথায় দিয়ে শিবালয়ের বাড়িটার সামনে এসে নামল দীনেশ; মন্মথ দাশগুপ্ত এল সিল্কের চাদর থেকে আতরের গন্ধ ছড়াতে ছড়াতে; গরদের কোটে সোনার চেন ঝুলিয়ে আর দশ আঙুলে দশটা আংটি পরে এল লোহা ব্যবসায়ী বন্ধুরা। লাল কালিতে ছাপা প্রজাপতির ছবি আঁকা প্রীতি-উপহার যখন হাতে হাতে ঘুরতে লাগল, সেই সময় গার্গী কাঁপা হাতে বরমাল্য পরিয়ে দিলে দীনেশের গলায়।

তুলসীঘাটের গঙ্গা: যেখানে বটের দীর্ঘব্যাপ্ত ছায়ার নিচে বিমর্ষ সন্ধ্যার পাণ্ডুরতা ছড়ায়। অখণ্ড নির্জনতার মধ্যে শান্ত গম্ভীর একটা সুরের কাঁপন রেখে থেমে যায় তুলসী-মন্দিরের দিনান্তিক ভজন: "যো তু তুলসী কৃপালু, চরণে শরণ পাওয়ে।" বিজলীর আলোটা জ্বলে, ওঠে—হাওয়া-লাগা-বটের পাতার সঙ্গে সঙ্গে আলোছায়া দুলতে থাকে ঘাটের সিঁড়িতে এলিয়ে থাকা পৌরাণিক অসুরের মতো মাটির ভীম-মূর্তির ওপরে। চবুতরার ওপরে ধ্যানস্থ দণ্ডীকে যেন পাথরে গড়া বলে মনে হয়—গঙ্গার জলে কে যেন একটানা অনুষ্টুপ ছন্দে মন্ত্র উচ্চারণ করে, আর অন্ধকার চেতনার মধ্যে কয়েকটা উজ্জ্বল উপলব্ধির মতো তিন চারটি প্রদীপ কালো স্রোত বেয়ে ধীরে ধীরে ভেসে যেতে থাকে।

হাটখোলা অঞ্চলে যেখানে মৈত্রদের বাড়ি, তার পেছনেও গঙ্গা। মাঝখানে শুধু নোংরা কয়েক জোড়া রেলের লাইন আর ধূলিধূসর স্ট্র্যাণ্ড রোড। কোণাকুণি তাকালে রথতলা ঘাট— এখন আর রথের কোনো বালাই নেই সেখানে। তবে রথের দেশের মানুষ কিছু আছে। অর্থাৎ গুটিকতক ওড়িয়া বসে আছে চন্দনের বাটি সাজিয়ে নিয়ে। বাঁধানো পোস্তার গায়ে

মাথা খুঁড়ছে ঘোলা গঙ্গা। পাশেই আণ্ডার-গ্রাউণ্ড ড্রেনের একটা মস্ত মুখ, যখন সেটা খুলে দেওয়া হয়, তখন দুর্গন্ধ বিবর্ণ জলের তোড়ে আধখানি গঙ্গাই কালো হয়ে যায়। শুধু মানুষের মনের আবর্জনাই নয়, পতিতপাবনী মানুষের দেহের কলুষও কতখানি মোচন করতে পারেন প্রতিদিন যেন সেই পরীক্ষাই দিতে হয় তাঁকে।

কাশীর গঙ্গা আর কলকাতার গঙ্গা! জাত আলাদা, রীতি আলাদা। তুলসীঘাটে রাত যত গভীর হয়, ততই যেন অন্ধকারের হৃদয় থেকে ঝঙ্কার ওঠে: 'জয় রাম, জয় রাম, জয় রঘুরাই।' আর কলকাতায় এই গঙ্গার ধারে নিথর মাঝরাতে ঝলকায় গুণ্ডার ছুরি, মাতাল গণিকাকে নিয়ে এসে থামে দু-একখানা রিক্সা—অশ্লীল গাল দিয়ে উঠে কুকুরকে কেউ ঢিল ছুঁড়ে মারে আর কাশী মিত্র ঘাটের এক আধটা শ্মশানবাসী গাঁজাখোর সন্ন্যাসী নেশার ঘোরে অকারণ ঝম্ ঝম্ করে চিমটে বাজায়।

পশ্চিমের জানলাটা খুলে গার্গী তাকিয়ে থাকে গঙ্গার দিকে। সবটা মিলে কেমন অপরিচ্ছন্ন, ক্লেদাক্ত বলে মনে হয়। গঙ্গা আছে—অথচ মুক্তি নেই। এপারে-ওপারে পাকে পাকে তার স্রোতে বাঁধা পড়ে আছে—যেন বিশাল নির্মল একটা পৃথিবীকে হারিয়ে বাঁধা পড়ে গেছে পঙ্কের অবরোধে। গার্গীর কান্না পায়। শুধু এক দিন কেন—একটি মুহূর্তও তার কলকাতায় থাকতে ইচ্ছে করে না।

বাড়িটা মস্ত বড়—তিনতলা মিলে প্রায় কুড়িখানা ঘর। কিন্তু থাকবার লোক নেই। অন্নপূর্ণা তেতলার এককোণে বাসা বেঁধেছেন, তার পাশেই সিঁড়ি দিয়ে উঠে ছাতের ওপর ঠাকুরঘর। দিনের মধ্যে বেশির ভাগ সময়ই এই চৌহদ্দিটুকুর ভেতরে কাটে অন্নপূর্ণার। তাছাড়া দীনেশ আর গার্গীর প্রয়োজনে দোতলার খুব সামান্য অংশই ব্যবহার হয়। নিচের তলায় ঠাকুর চাকর কোন্ প্রান্তে যে কোথায় কে থাকে, গার্গী তাও ভালো করে জানে না।

এত আগ্রহ করে অন্নপূর্ণা গার্গীকে সংসারে এনেছেন, কিন্তু দেখা যাচ্ছে আনার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর দায়িত্ব গেছে ফুরিয়ে। এক তাড়া চাবি গার্গীর

হাতে তুলে দিয়ে বলেছেন, বাঁচলাম বৌমা, এ পাপ এবার তুমিই নাও। কিন্তু গার্গী ভেবে পায় না, কতগুলো বাক্স আলমারী আর দেরাজ খোলবার জন্যেই কি এ বাড়িতে তাকে দরকার ছিল?

বাঁধা নিয়মে ঠাকুর রান্না করে, বাঁধা নিয়মেই বাড়ীর সব চলে। নিতান্ত কোনোদিন অপারগ না হয়ে পড়লে স্বপাক হবিষ্যই খান অন্নপূর্ণা। এই এক মাসের মধ্যে গার্গী আবিষ্কার করেছে, সে এ বাড়িতে একটা অতিরিক্ত আসবাব মাত্র, নিচের সিঁড়ির কোণে কালোপাথরের দুটি মূর্তির মতোই। থাকলে ভালো দেখায়, না থাকলেও ইতর-বিশেষ কিছু ঘটত না। কথাটা আরো বেশি করে মনে হয় দীনেশকে দেখে। আটটা বাজতে না বাজতেই বেরিয়ে যায়, কোনোদিন বারোটা-একটা নাগাদ একবার আসে, কোনো দিন তাও নয়। রাত দশটায় ফিরে বিছানায় গা মেলতে না মেলতেই তার নাক ডাকতে শুরু হয়—স্বভাব-নীরব দীনেশের নাসা সারারাত আশ্চর্য মুখর হয়ে থাকে। প্রথম প্রথম গার্গী ঘুমুতে পারত না—আজকাল অভ্যেস হয়ে গেছে। আর খালি মনে হয় এ বাড়ীতে সে অবান্তর—কুড়িখানা ঘরের অনাদৃত একরাশ ফার্ণিচারের সঙ্গে আর একটা নতুন সংযোজনা।

গঙ্গার ওপর দিয়ে তীব্র স্বরে বাঁশি বাজিয়ে স্টিমার চলে গেল একটা। দীর্ঘশ্বাস ফেলে গার্গী সরে এল জানালার কাছ থেকে। অন্নপূর্ণার আহ্নিক বোধ হয় শেষ হয়েছে।—এবার তাঁকে জলখাবার দিতে হবে।

ঠাকুর ঘরের সামনে অন্নপূর্ণা উৎসুকভাবে দাঁড়িয়ে ছিলেন। গার্গী গিয়ে ডাকল,—মা, খাবেন চলুন।

অন্নপূর্ণা বিব্রত মুখে বললেন, খাব কী করে? ঠাকুরমশাই যে এখনো এলেন না!

—কী হয়েছে মা?

—এবেলা যে পুজো করব ভেবেছি। ঠাকুরমশাই এসে সেরে দিয়ে গেলে তবে জলফোঁটা মুখে দিতে পাব। এদিকে প্রায় দশটা বাজল, আসবার তো কোনো লক্ষণ দেখছি না।

গার্গী বললে, কতক্ষণ এভাবে আপনি কষ্ট করবেন মা? পুজোটা নিজেই সেরে নিন্ না।

অন্নপূর্ণা বললেন, পুজো না হয় করলাম, কিন্তু মন্ত্র পড়ে দেবে কে? ওসব সংস্কৃত-ফংস্কৃত বাপু আমার মুখ দিয়ে বেরুবে না।

গার্গী হাসলে: বেশ তো মা। পুজোয় আপনি বসুন, মন্ত্র আমিই না হয় পড়ব।

পুলকিত বিস্ময়ে চোখ বিস্ফারিত করলেন অন্নপূর্ণা: তুমি সংস্কৃত পড়তে জানো বৌমা?

—বাবা কিছু কিছু শিখিয়েছিলেন। আপনি ভাববেন না মা—ও হয়ে যাবে এক রকম করে।—মৃদুকণ্ঠে গার্গী জবাব দিলে।

অপরিমিত খুশি হয়ে অন্নপূর্ণা বললেন, তাই তো বৌমা, তুমি যে অতবড় পণ্ডিতের মেয়ে সে কথা তো ভুলেই গিয়েছিলাম। যাক, ভালোই হল। এখন থেকে সব কাজে আর পুরুতবাড়ি ছুটতে হবে না।

সকালে উঠেই দোকানে ছুটেছিল দীনেশ। কাল সন্ধ্যায় একটা হিসেব কিছুতেই মেলেনি, সারাটা রাত সেটা যেন দীনেশের মগজের ভেতরটা কুরকুর করে ঘুণের মতো কেটেছে। মনটা এত চঞ্চল ছিল যে, রাতের মধ্যে একবারও নাক ডাকেনি তার। আজ সকালেই তাই তটস্থ হয়ে দোকানে এসে পৌঁছেছে।

ঘণ্টা দুই খাটুনির পর হিসেব মিলিয়ে দীনেশ যখন স্বস্তির শ্বাস ছাড়ল তখন মাথার ওপর টং করে ঘড়ির আওয়াজ হল একটা। তাকিয়ে দেখল সাড়ে ন'টা।

তখনি বিদ্যুৎচমকের মতো একটা কথা তার মনে পড়ল। কাল সন্ধ্যে-বেলায় যখন সে বাড়ি ফিরছিল তখন রাস্তার মোড়ে দেখা হয়েছিল বাড়ির ঠাকুর মশাইয়ের সঙ্গে। তাঁর ছেলের অসুখের খবর পেয়ে রাতের গাড়িতে তিনি কাটোয়া যাচ্ছেন। সকালে আসতে পারবেন না।

সর্বনাশ—মাকে তো সে কথা বলা হয়নি! গরমিল হিসেবটা মনকে এমন ভাবে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল যে, অন্য একটা ব্যবস্থা করতেও বেমালুম ভুলে গেছে দীনেশ। ফলে যা হওয়ার তাই হবে। মাকে হয়তো উপোস করেই বসে থাকতে হবে সারাটা দিন।

—আমি আসছি—বলেই চাবির তাড়াটা কোমরে গুঁজে নিয়ে দীনেশ উঠে পড়ল, তারপর সোজা ট্রামে করে এল বিডন স্ট্রিটের মোড়ে। তার ইস্কুল-জীবনের পণ্ডিত রামরত্ন বাচস্পতি এখানে থাকেন। পণ্ডিতী আজকাল ছেড়ে দিয়েছেন, পূজো-অর্চনা করেন, অবসর সময় 'ভৃগু-সংহিতা' নিয়ে কাটান।

রামরত্নকে বাড়িতেই পাওয়া গেল। শুনে বললেন, সেজন্যে কী হয়েছে! চলো, আমি এখনি যাচ্ছি।

ট্যাক্সি ডেকে দীনেশ বাচস্পতিকে নিয়ে গেল।

কিন্তু তেতলা পার হয়ে সিঁড়ির দিকে পা বাড়াতে দুজনেই থমকে দাঁড়ালেন।

চমৎকার সুরেলা গলায় সংস্কৃত-মন্ত্রের আবৃত্তি কানে আসছে। নির্ভুল হ্রস্ব-দীর্ঘের উচ্চারণ—নিখুঁত মন্ত্রপাঠ।

চকিত হয়ে বাচস্পতি বললেন, বাঃ! মন্ত্র পড়ছে কে?

নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছে না দীনেশ—অথবা বিশ্বাস করার মতো মনের অবস্থাও তার নয়। দীনেশ অস্ফুট কণ্ঠে বললে, বুঝতে পারছি না।

বাচস্পতি ওপরে উঠে গেলেন, পিছে পিছে তাঁকে সভয়ে অনুসরণ করলে দীনেশ। হ্যাঁ—পৃথিবীতে এখনো অনেক অবিশ্বাস্য ঘটনা ঘটে—ঘটে অনেক কল্পনাতীত ব্যাপার। অন্নপূর্ণা হাতজোড় করে চোখ বুজে বসে আছেন আর গরদের একখানা লালপাড় শাড়ী পরে পুঁথি খুলে গার্গী মন্ত্র পড়ে চলেছে।

বাচস্পতি মুগ্ধ চোখে চেয়ে রইলেন। দীনেশের মুখ মুহূর্তে কালির মতো কালো হয়ে গেল—মনে হল, তার পায়ের তলায় বাড়িটা যেন ধ্বসে পড়ে যাচ্ছে।

বাচস্পতি বললেন, বাঃ, বাঃ, খাসা!

গার্গী চমকে উঠে পুঁথি নামালো, ঘোমটা টেনে দিলে মুখের ওপর। অন্নপূর্ণা বললেন, আসুন পণ্ডিত মশাই, আসুন।

বাচস্পতি হেসে বললেন, আমার আর আসবার দরকার হবে না। আমার চেয়ে বড় পণ্ডিত আপনি পেয়েছেন দেখছি। কে এই মেয়েটি?

অন্নপূর্ণা বললেন, বাঃ, এ যে আমার বৌমা। দীনেশের স্ত্রী।

—দীনেশের স্ত্রী!—বাচস্পতি বললেন, কী আশ্চর্য! এ যে বানরের গলায় মুক্তোর হার দেখছি! দীনেশের তো কোনোদিন 'নর' শব্দের রূপটাও সম্পূর্ণ মুখস্থ হল না। এমন চমৎকার সংস্কৃত তুমি কোথায় শিখলে মা?

অন্নপূর্ণা সগর্বে বললেন, বৌমা যে আমার কাশীর মেয়ে। ওর বাবা সেখানকার নামকরা পণ্ডিত।

—তাই বলুন। কাশীর পড়া না হলে এমন উচ্চারণ হয়! তা ভালোই করেছেন মৈত্র গিন্নি। এ বাড়িতে লক্ষ্মী তো বরাবরই বাঁধা, কিন্তু সরস্বতীর ঠাঁই এত কাল ছিল না। এবার লক্ষ্মী সরস্বতী দুই-ই হল। তা এক কাজ কোরো বৌমা, দীনেশকে মাঝে মাঝে এক আধটু পড়িয়ে শুনিয়ে দিয়ো। ওটা খালি লোহাই চিনলো, পারো তো মানুষ করার চেষ্টা কোরো।

বলে, বাচস্পতি সশব্দে হেসে উঠলেন। তারপর পেছন ফিরে তাকালেন দীনেশের সমর্থন পাওয়ার আশায়। কিন্তু দীনেশকে দেখতে পাওয়া গেল না। এরই মধ্যে কখন সে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেছে—নেমে গেছে একেবারে সদর রাস্তায়।

দুপুরে দীনেশ খেতে এল না। দোকানে বসে যে ডাল-রুটি আনিয়েছিল তার দু-এক টুকরো মুখে দিয়েই ছুঁড়ে ফেললে রাস্তায়। সামান্য ব্যাপারে কর্মচারীদের যা খুশি গালাগাল করতে লাগল। ব্যাঙ্ক থেকে ফিরতে একটু দেরী হওয়ার অপরাধে একটা চাকরকে চটি ছুঁড়ে মারলে, লোকটা মৃদু প্রতিবাদ করতেই মাইনে মিটিয়ে দিয়ে তৎক্ষণাৎ জবাব দিলে তাকে।

পাঞ্জাবের একটা বড় পার্টির সঙ্গে রেটের অল্প গোলমাল নিয়ে তুলকালাম কাণ্ড বাধিয়ে তুলল, তারপর চীৎকার করে বললে, দরে না পোষায় আর কোথাও যান। আপনাদের সঙ্গে আমার ব্যবসা চলবে না।

এক কথায় সারাদিন অদ্ভুত বন্যতার মধ্য দিয়ে কাটাল দীনেশ। একটা উদ্দাম পাগলকে ঘরের মধ্যে বন্ধ রাখলে যেমন সবকিছু সে ভাঙচুর করতে থাকে, আর কিছু না পেলে কামড়ে রক্তারক্তি করতে থাকে নিজের হাত, দীনেশ যেন তাই করলে। চেতনার মধ্যে অসহ্য জ্বালা জ্বলতে লাগল একটা। তাকে ঠকানো হয়েছে, একটা ক্ষমাহীন মিথ্যাচার করা হয়েছে তার সঙ্গে। জীবনে যা সে চেয়েছিল, পেয়েছে ঠিক তার উল্টো। যেন তার সমস্ত আকাঙ্ক্ষাকে নিয়ে একটা অর্থহীন নিষ্ঠুর কৌতুক করে বসেছে কেউ।

রাত্রে যখন সে বাড়ি ফিরল, তখন মেঘের মতো অন্ধকার তার মুখ; তার ওপরে বজ্র থম থম করছে। ঘরে ঢুকে সে একটা কথাও বললে না কারুর সঙ্গে। সশব্দে চাবির গোছাটা টেবিলে ফেলে দিলে, জামাটা ছুঁড়ে ফেললে দূরে, তারপর বারান্দার অন্ধকার কোণায় একটা ইজি-চেয়ার টেনে নিয়ে ঝিম মেরে বসে রইল।

অন্নপূর্ণা উৎকণ্ঠিত হয়ে পাশে এসে দাঁড়ালেন।

—খাবার দিয়েছে বাবা, হাত মুখ ধুয়ে নে।

দীনেশ হঠাৎ ইজি-চেয়ারে সোজা হয়ে উঠে বসল। অন্ধকারে তার চোখ দুটো জন্তুর মতো জ্বলতে লাগল দপ দপ করে।

—এ ব্যাপারটা আমার সঙ্গে তোমাদের না করলেই কি চলছিল না মা?

কথার ভঙ্গিতে সভয়ে সরে দাঁড়ালেন অন্নপূর্ণা।

—কী হয়েছে বাবা?

—আমাকে এমনভাবে ঠকানোর কী দরকার ছিল?

—কে আবার তোকে ঠকালো?—অন্নপূর্ণার বিস্ময় সীমাহীন।

—জেনে শুনেও কেন বোকা সাজছ মা?—মাত্রা-ছাড়ানো অভদ্র গলায়

দীনেশ বললে, তুমি তো জানো আমি ঘর-গেরস্থের মেয়েই সংসারে আনতে চেয়েছিলাম। কাশীর পণ্ডিত চাইনি!

অন্নপূর্ণা এইবার ব্যাপারটা হদিশ পেলেন? হেসে বললেন, ওঃ বাচস্পতি মশায়ের কথা? ওতে কি রাগ করতে আছে নাকি? উনি তো তোকে পড়িয়েছেন—ও সব দু-চারটে কথা তোকে উনি বলতে পারেন বই কি।

দীনেশ আগুন-ঝরা স্বরে বললে, পণ্ডিত মশাই যা খুশি বলুন, কিছু আসে যায় না। কিন্তু আমি এ কখনো চাইনি মা যে তোমার ছেলের বৌ ঘরে বসে শাস্তরের শোলোক আওড়াবে।

অসীম বিস্ময়ে অন্নপূর্ণা বললেন, কথা শোনো একবার পাগলের! আরে, ওতে হয়েছে কী! না হয় দু-ছত্র পড়েইছে, তাতে—

দীনেশ প্রায় চীৎকার করে উঠল: তুমি চুপ করো মা! সব জিনিস তুমি বোঝো না—একথাও বুঝবে না। কিন্তু একটা কথা জেনে রাখো, তোমাদের এই ভুলের জন্যে আমার সমস্ত জীবনটাই তোমরা নষ্ট করে দিলে!

চেয়ার ছেড়ে দীনেশ উঠে পড়ল: আজ রাতে আমি আর খাব না। আমাকে কেউ যেন বিরক্ত না করে।

ছাতের দিকে তার বিলীয়মান মূর্তিটার দিকে বিহ্বল হয়ে তাকিয়ে রইলেন অন্নপূর্ণা। আর পাশের ঘরে দীনেশের জন্য সুপুরী কুচোতে গিয়ে যে জাঁতিটা এতক্ষণ স্তব্ধ হয়ে ছিল গার্গীর হাতে, এবার সেটা ঘ্যাঁচ করে তার বুড়ো আঙুলের ওপর বসে গেল! টপ্‌টপ্‌ করে রক্ত পড়তে লাগল নিচের পানের বাটাটার ওপর।

হাঁ—দীনেশের প্রত্যেকটা কথাই শুনতে পেয়েছে গার্গী। একটা শব্দ—একটা শব্দও তার বাদ যায়নি।

—চার—

রাত্রে দীনেশ যখন শুতে এল, তখন সেই জানলাটার কাছে দাঁড়িয়েছিল গার্গী। চন্দ্রহীন রাত্রির কালো গঙ্গা—এপারে-ওপারে এক একটা করে আলো নিভে আসছে। ওপারের কলগুলো অন্ধকারের একসার হিংস্র দাঁতের মতো জ্বলজ্বল করছে আর কোথা থেকে লোহার পাত পেটানোর ঝন্ ঝন্ শব্দ শোনা যাচ্ছে একটা।

পায়ের শব্দ-সাড়া তুলে ঘরে ঢুকল দীনেশ, বেশ জানান দিয়েই। টেবিলের ওপর রাখা জলের গেলাসটা তুলে নিয়ে অভ্যাসমতো ঢক ঢক করে গলায় ঢেলে দিলে। তারপর সশব্দে এলিয়ে পড়ল বিছানায়।

আস্তে আস্তে পাশে এসে দাঁড়ালো গার্গী।

—কিছু খেলে না কেন?

—ক্ষিদে নেই।—অবরুদ্ধ গলায় দীনেশ জবাব দিলে।

—আমার ওপর রাগ করেছ তুমি?

পাশবালিশের ওপর কনুই রেখে আধ-শোয়া ভঙ্গিতে দীনেশ মাথা তুলল: তোমার ওপরে কেন রাগ করতে যাব?

—আমার তো তাই মনে হল।

দীনেশ বললে, শোনো। বনেদী বাড়ি আমাদের, বাপ-ঠাকুর্দার আইনেই চলে। চলবেও চিরকাল। এখানে ঘরের বউকে পণ্ডিতী করে খেতে হয় না।

গার্গীর মুখ লাল হয়ে উঠল: মার পুজোর মন্ত্রগুলো পড়ে দিলেই কি পণ্ডিতী করা হয়?

দীনেশের স্বর বিস্বাদ হতে লাগল: ওসব মন্ত্রতন্ত্র আওড়াবার জন্যে এখানে ভট্‌চায-পুরুত অনেক মেলে। বাড়ির বৌ-ঝিদের সুর করে তা না পড়লেও চলে।

কথাটা এমন বাঁকা এবং আক্রমণটা এতই অর্থহীন যে গার্গী এবারে চুপ করে গেল। সন্ধ্যাবেলায় দীনেশের ক্ষিপ্ত উত্তেজনার সবই তার কানে গেছে। কিন্তু তখনও যেমন সে-কথাগুলোর কোনো অর্থ সে বুঝতে পারেনি, এখনো তেমনি পারল না। চাপা মৃদু কণ্ঠে গার্গী বললে, তবে তুমি কী চাও?

দীনেশ বললে, ঘরের বৌকে বৌ বলেই দেখতে চাই।

—বুঝতে পারছি না।

দীনেশ হঠাৎ ধৈর্য হারালো: এসব কথা না বোঝার মতো কচি খুকী তুমি নও! ন্যাকামি কোরো না ওভাবে! শুনলে গা জ্বালা করে আমার।

কিন্তু বিনা-অপরাধে এতক্ষণ ধরে একটার পর একটা বর্বর আঘাত খেয়ে এইবার খানিকটা গা জ্বালা করার অধিকার গার্গীরও ছিল বইকি। সারা মুখের ত্বক তার জ্বালা করে উঠল। শান্ত গভীর কালো চোখে ঝল্‌কে গেল বিদ্যুৎ। টেবিলের একটা কোণা মুঠো করে চেপে ধরল গার্গী।

—একটু ভদ্রভাষায় কি কথাবার্তা বলা যায় না?

ইস্পাতের ওপর হাতুড়ির ঘা পড়ে ঠিকরে উঠল আগুনের ফুল্‌কি। দীনেশ এবার উঠে বসল—উঠে বসল বড়বাজারের লোহার ব্যবসায়ী দীনেশ। মাথার ছাঁটা-ছাঁটা চুল খাড়া হয়ে উঠল যুদ্ধার্থী সজারুর পিঠের কাঁটাগুলোর মতো।

এর পরে দীনেশের মুখ থেকে যেমন আশা করা যায়, ঠিক তাই বেরিয়ে এল। রাগে পিট পিট করতে লাগল চোখ—মৈত্র পরিবারের বংশানুক্রমিক আভিজাত্যের মধ্যে না জন্মালে হয়তো এই মুহূর্তে সে গার্গীর চুলগুলো মুঠোর ভেতরেই টেনে ধরত।

দীনেশ বললে, স্বামী গুরুজন, মান রেখে যে তার সঙ্গে কথা কইতে হয়, বাপের বাড়িতে এ শিক্ষাও কি তুমি পাওনি? শুনেছি, তোমার বাবা খুব বিদ্বান লোক। এই বিদ্যাই কি মেয়েকে তিনি দিয়েছেন?

সর্বাঙ্গ শির শির করতে লাগল গার্গীর। একটিমাত্র কথা বলা চলে এর পরে—দেওয়া যায় একটিমাত্র জবাব। বলা যায়: আমার বাবার শিক্ষার এক কণা পেলেও তোমাদের এই বাড়ি ধন্য হয়ে যেত। টাকা তোমাদের

অনেক আছে, কিন্তু আমার বাবার জ্ঞান আর পাণ্ডিত্যের ঐশ্বর্য এক বিন্দু পেতে চাইলেও তোমরা দেউলে হয়ে যাবে।

কিন্তু সে-কথা বলার অর্থ দীনেশের এই ক্ষিপ্ততার আগুনে আরো খানিকটা ইন্ধন জোগানো; কেবল একরাশ দুর্গন্ধ পাককে নাড়া দিয়ে বীভৎসতার আরো খানিক আবিলতা ফেনিয়ে তোলা; একটা নোংরা চেঁচামেচির সৃষ্টি করে এই ঘুমন্ত রাত্রিকে ভেঙে খান্ খান্ করে দেওয়া—ঘুমের মধ্যে চমকে ওঠা প্রতিবেশীদের বিরক্তি আর কৌতুকের উপাদান জোগানো। কত সামান্য ব্যাপার নিয়ে কী অসংযত পরিমাণে চীৎকার করতে পারে দীনেশ, এই এক মাসের মধ্যেই সে-সম্পর্কে যথেষ্ট অভিজ্ঞতাই তার হয়েছে। কথায় কথায় চাকরকে জুতো পেটা করতে চাওয়া দীনেশের পৌরুষের অভিব্যক্তি— দোকানে বেরুবার সময় পানের থেকে চুনটি খসে গেলে বাড়িশুদ্ধ লোকের বাপ-বাপান্ত করা তার দৈনন্দিন অভ্যাস। দীনেশ জানে—মর্মে মর্মে জানে সে এই বাড়ির মালিক; তার প্রভুত্ব ঠাকুর-চাকর থেকে আরম্ভ করে স্ত্রী পর্যন্ত একটি বৃত্তরেখায় বেষ্টিত।

পাথরের চোখের মতো একটা ভাষাহীন দৃষ্টি কিছুক্ষণ মেলে রাখল গার্গী, তারপর প্রায় নিঃশব্দ স্বরে বললে, মাপ করো, আমার অন্যায় হয়েছে।

দীনেশ বললে, আমি সোজা মানুষ, সোজাসুজি বুঝি। ওসব কাশীর চালাকি আমার সঙ্গে চলবে না—একথা মনে রেখো।

বিদীর্ণ হয়ে পড়ার চূড়ান্ত মুহূর্তটাকে প্রাণপণে গার্গী সামলে নিলে, তারপর ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে যেতে বললে, আমার মনে থাকবে।

আগ্নেয় চোখে সন্দিগ্ধ মনে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল দীনেশ। গার্গীর স্বীকারোক্তিটা বশ্যতার না ব্যঙ্গের, ঠিক স্পষ্ট করে বোঝা যাচ্ছে না। কিন্তু যাই হোক—দীনেশ নিজেকে জানে, নিজের শক্তির সঙ্গে তার পরিচয় আছে। দরকার হলে কঠোরতার শেষ স্তরে গিয়েও সে পৌঁছুতে পারে। আড়াইশো টাকার হিসেবের গোলমালের জন্য যখন আঠারো বছরের পুরোনো কর্মচারীকে পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছিল, তখনও সে একবিন্দু দ্বিধা অনুভব করে নি;

গরীবের সংসারে ছেলেপুলে না খেয়ে মরে যাবে বলে যখন লোকটা দীনেশের পায়ের ওপর টপটপ করে চোখের জল ফেলেছিল, তখনো সে জলে এতটুকু ভেজেনি দীনেশ। সে সোজা মানুষ, কিন্তু একবার বেঁকলে তাকে সরল করা সাধ্য নয় আর। সে স্ত্রী-ই হোক আর যে-ই হোক।

সমস্ত ক্রোধ আর বিরক্তি ছাপিয়ে হঠাৎ নিবিড় একটা আত্মপ্রসাদে দীনেশের মন ভরে উঠল। প্রথম দিনের পক্ষে তার এই পরিচয়টুকুই যথেষ্ট। দরকার হলে নিজেকে ভালো করে প্রকাশ করা যাবে যথাসময়ে।

একটা হাই তুলে দু-হাতে আঙুলগুলো মটকালো দীনেশ। তারপর পাশ বালিশ জড়িয়ে শুয়ে পড়ল। মিনিট তিনেক যেতে না যেতেই নিবিড় তন্দ্রাতে নাক ডাকতে লাগল তার।

আর বারান্দার অন্ধকারে একটা থামের গায়ে মাথা রেখে বসে রইল গার্গী। আজ রাতে দীনেশ নিজে খেল না, তাকেও খেতে দিল না। কিন্তু এর পর থেকে এ বাড়ীর অন্ন সহজভাবে তার গলা দিয়ে গলবে তো?

নিজের প্রশ্নের উত্তর নিজের মনের কাছে চাইতে গিয়েই গার্গী শিউরে উঠল। চোখ তুলে তাকাল সে। মাথার উপর আকাশটাকে অনেকখানি শূন্য আর অনেক বেশি অন্ধকার বলে মনে হল আজকে।

—বৌমা—

ডাক দিয়ে অন্নপূর্ণা ঘরে ঢুকলেন।

একটা সেলাই নিয়ে বসেছিল গার্গী—মাথার ওপর ঘোমটাটা নামিয়ে দিয়ে উঠে দাঁড়াল।

—কী মা?

সঙ্গে সঙ্গেই কোনো জবাব দিলেন না অন্নপূর্ণা। কেমন অপ্রতিভ, কেমন লজ্জিত। যে কথা বলতে এসেছেন যেন সহজে বলতে পারছেন না, অস্বস্তি বোধ করছেন।

কিছুক্ষণ নিঃশব্দে কাটাবার পরে গার্গী আবার জিজ্ঞাসা করলে, কিছু বলবেন ?

অন্নপূর্ণা যেন সাহস পেলেন।

—দীনেশ কাল তোমায় কিছু বলেছে নাকি ?

অনিচ্ছাসত্ত্বেও একটা বিষণ্ণ হাসি গার্গীর ঠোঁটের কোণায় ফুটে উঠল : না, সে বিশেষ কিছু নয়।

বিশেষ কিছু নয়! সম্পূর্ণ বিশ্বাস করতে পারলেন না অন্নপূর্ণা। তবু কোথায় যেন একটুখানি আরাম বোধ করলেন : সামান্য পুঁথিপড়া নিয়ে এমন একটা কাণ্ড যে করবে, তা আমি ভাবতেই পারিনি। ওর ওই দোষ। তোমায় বলতে কি বৌমা, লেখাপড়া জানা মেয়ে বিয়ে করতে দীনেশের বরাবরই আপত্তি ছিল। একালের ছেলে হয়েও এমন বুদ্ধি ওর কোথা থেকে এল কে জানে।

আবছায়া অন্ধকারে আলো পড়ল। দীনেশের ব্যবহারের ভেতর একটা পারম্পর্য এতক্ষণে ধরা দিতে লাগল গার্গীর কাছে। বিদ্যা দীনেশের কাছে বিভীষিকা - তাই বটে। সেজন্য এ-বাড়ি তন্নতন্ন করে খুঁজলেও হিন্দু-সর্বস্ব, স্তব-কবচমালা, স্তোত্ররত্নমালা, একখানা গীতা আর স্তূপাকারে সাজানো খান পঁচিশেক পুরোনো পঞ্জিকা ছাড়া পড়বার মতো একটুকরো কিছুই আর পাওয়া যাবে না।

—কিন্তু বাড়াবাড়িরও একটা সীমা আছে—অন্নপূর্ণা উত্তপ্ত হয়ে উঠলেন। তাঁর চাইতে এ-কথা বেশি করে আর কে জানে যে গার্গী স্বেচ্ছায় এ বাড়িতে পা দেয়নি, গলবস্ত্র হয়ে চন্দ্রশেখর সান্যাল সামনে এসে দাঁড়িয়ে কোনোদিন বলেননি : বিপন্ন ব্রাহ্মণকে কন্যাদায় থেকে উদ্ধার করুন। নিজেই যেচে গেছেন অন্নপূর্ণা, প্রায় জোর করে গার্গীকে ছিনিয়ে এনেছেন চারশো মাইল দূরে শিবালয়ের নিভৃত বাড়ীটি থেকে। তাই দীনেশের উষ্মাটা অন্নপূর্ণাকেও স্পর্শ করেছে, অপমানের খোঁচাটা এসে লেগেছে তাঁরও গায়ে।

অন্নপূর্ণা বললেন, অত করবার কী ছিল ? এমন কিছু এল্-এ বি-এ পাশ নয়, খ্রীস্টানীদের মতো জুতো-মোজা পায়ে পরে রাস্তা দিয়ে হেঁটেও যায়

না। দু-খানা পুঁথি পড়তে পারা কি মন্দ ? কিন্তু তা নয়—যেমন হতভাগা ছেলে, তেমনি তার বুদ্ধি !

গার্গী বললে, তা আর কী হয়েছে মা! ভবিষ্যতে কোনোদিন আমি আর ওসব পড়ব না, তাহলেই হবে।

অন্নপূর্ণা চটে উঠলেন : কেন পড়বে না ? দীনেশের ভয়ে নাকি ? আমি যতদিন বেঁচে আছি, ততদিন আমিই সংসারের গিন্নী—যা বলব তাই হবে। পড়বে বইকি, হাজার বার পড়বে।

—কিন্তু তাতে করে শুধু মিথ্যে অশান্তির সৃষ্টিই হবে মা।

—অশান্তি! কে করবে অশান্তি! আমারি পেটের ছেলে ও—সে কথা ভুলো না বৌমা!

সগর্বে নিজেদের মর্যাদা অন্নপূর্ণা ঘোষণা করতে চাইলেন। কিন্তু এই একমাসের মধ্যে গার্গী স্পষ্ট বুঝতে পেরেছে, অন্নপূর্ণার এই গর্বের আড়ালে জোরটা তত বেশি নেই। এ তাঁর স্বামীর যুগ নয়। মনে মনে তিনিও দীনেশকে ভয় করেন ; এই সংসারের সমৃদ্ধির বারো-আনাই দীনেশের স্বোপার্জিত—পৈতৃক অর্থের স্বাচ্ছন্দ্যে পায়ের ওপর পা তুলে সে দিন কাটায় নি।

অন্নপূর্ণা বললেন, তুমি মনে কষ্ট পেয়োনা বৌমা। সংসারে আমিই তোমায় এনেছি, যতদিন বাঁচব, এতটুকুও দুঃখ তোমায় পেতে দেব না। তবে আর একটা কথাও বলি। দীনেশ কথাবার্তাটা তেমন ভালো বলতে পারে না বটে, কিন্তু মনটা ওর একেবারে শাদা। ওর মতে একটু যদি মানিয়ে চলা যায়, তা হলে দেখবে একেবারে মাটির মানুষ !

এইবার গার্গীর সশব্দে হেসে উঠতে ইচ্ছে করল। অন্নপূর্ণা বুদ্ধিমতী—দু-দিকেই তিনি রাখতে জানেন। সংস্কৃত পুঁথি পড়াটাকে তিনি অন্যায় মনে করেন না, অথচ সেই সঙ্গে দীনেশের মতো করে মানিয়ে চলবার উপদেশ দিয়ে চলেছেন অম্লান মুখে। একদিকে নিজের অহমিকা—অন্যদিকে আশঙ্কা —দুয়ের মাঝখান দিয়ে চলবার মতো একটি সুন্দর মধ্যপন্থা তিনি বের করে

নিয়েছেন! কিন্তু সে যে এই দুয়ের ভেতরে ঠিক কোন্‌খানে দাঁড়াবে, তাই খুঁজে পেল না গার্গী।

ব্যাপারটার একটা মনোরম সমাধান করে ফেলেছেন কল্পনা করে অন্নপূর্ণা খুশি হয়ে উঠলেন। বললেন, যাই, একটু গড়াই গে। তিনটে নাগাদ আমাকে ডেকে দিয়ো বৌমা।

—দেব—গার্গী উত্তর দিলে।

অন্নপূর্ণা বেরিয়ে যেতে সমস্ত ঘরের দিকে গার্গী একবার দৃষ্টি বুলিয়ে নিলে। সে-আমলের মেহগিনীর ভারি কাঠ, নিরেট লোহার সিন্দুক, বড় বড় আলমারী, চওড়া সোনালী ফ্রেমে বাঁধা রাণী ভিক্টোরিয়া আর রাজা পঞ্চম জর্জের ছবি। দেওয়ালে প্রকাণ্ড একটা ঘড়ি—অদ্ভুত রকমের গভীর তার আওয়াজ। ফাঁপা পাত্রের ওপর হাতুড়ির ঘা পড়বার মতো।

এখানে সব কিছুই নিরেট—সব কিছুই স্থির আর জমাট বেঁধে আছে। একটা বিচিত্র গন্ধভরা ছায়া একে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। কী একটা নিষেধ আছে এই ঘরে—এখানে সহজে যেন আলো আসতে চায় না—বাতাস যেন রুদ্ধ হয়ে যেতে চায়। শুধু ভারী ভারী ফার্ণিচারগুলো প্রাণহীন শীতলতায় স্তব্ধ হয়ে থাকে—ঘড়িটার আওয়াজ যেন প্রত্যেকটা আলমারী আর সিন্দুকের পুরোনো ক্লান্ত হৃৎপিণ্ডের মতো সাড়া তোলে; হঠাৎ মনে হয়, এখানে মুক্তি নেই—এখানে ভবিষ্যৎ নেই—শুধু একটা প্রকাণ্ড পাথরকে বুকের ওপর চাপিয়ে রেখে অনন্তকাল ধরে নিষ্প্রাণ জীবনের মধ্যে বেঁচে থাকতে হবে।

সেলাইটা কোলের ওপরে রেখে বিহ্বলের মতো গার্গী বসে রইল। এ কোথায় এল সে—এল কোন্ একটা কবরের মধ্যে! এখানেই তাকে থাকতে হবে! থাকতে হবে দিনের পর দিন—বছরের পর বছর!

আলো চাই—সেই সঙ্গে চাই বাতাস! সেই বাতাস—যা কাশীর গঙ্গার বুক থেকে উঠে আসে স্নেহস্নিগ্ধ শীতলতায়; সেই আলো যা বেণীমাধবের ধ্বজাকে ছোঁয়া দিয়ে দশাশ্বমেধ ঘাটের ছত্রগুলিকে রাঙিয়ে তোলে: 'ওঁ জবাকুসুমসঙ্কাশং'—

তাদের শিবালয়ে বাড়িতে একটা নিমগাছের ফাঁক দিয়ে সে আলো ঝর্ণার মতো ঝরে পড়ে। খোলা-মেলা ঘরগুলিতে সংক্ষিপ্ত জীবন-যাত্রার আয়োজন-গুলি ঝকঝক করে ওঠে। আর ঝলমল করে শেল্‌ফে আলমারীতে চন্দ্রশেখরের বইগুলি। মনের সামনে ছবি ভেসে আসে গার্গীর। রবীন্দ্রনাথের কবিতার বই খুলে গার্গীকে পড়ে শোনাচ্ছেন চন্দ্রশেখর, সকালের হাওয়া খেলা করে যাচ্ছে তাঁর অবিন্যস্ত ধূসর চুলগুলিতে :

'এত বড় এ ধরণী মহাসিন্ধু ঘেরা
দুলিতেছে আকাশ-সাগরে,
হেথা দিন দুই রহি মোরা মানবেরা
শুধু কি মা যাব খেলা করে?
তাই কি ধাইছে গঙ্গা ছাড়ি হিমগিরি
অরণ্য বহিছে ফুল-ফল,
শতকোটি রবি-তারা আমাদের ঘিরি
গণিতেছে প্রতি দণ্ড পল?'

সেই শান্ত উদাস স্বরের আবৃত্তিতে পৃথিবীর যেন রূপ বদলে যায়—জীবনের একটা নতুন অর্থ যেন মনের কাছে ধরা দিতে থাকে। 'নাই কি মা আমাদের গভীর ভাবনা, হৃদয়ের সীমাহীন আশা?' ছিল বইকি—সবই ছিল। মনে হত অপরূপ জীবন, অফুরন্ত কাজ—অপর্যাপ্ত সম্ভাবনা। একটা অনাহত 'মঙ্গল-গীতি' পৃথিবীর প্রাণকেন্দ্র থেকে দিনের পর দিন উৎসারিত হয়ে চলেছে—সেই সঙ্গীতের রেশ থেকে থেকে যেন চেতনার মধ্যে বেজে উঠত। আছে—সব আছে!

কিন্তু ভারী ভারী ফার্ণিচারের ছায়া-ঘেরা এই ঘর। শীতল, নিস্তব্ধ, হৃদয়হীন। ঘড়িটার অদ্ভুত আওয়াজ থেকে থেকে ঘরময় প্রতিধ্বনি তোলে। আর চারদিকে দীনেশের একটা কঠিন তুষার-স্পর্শ চেতনাকে কুঁকড়ে আনে—মনে হয় সব ফুরিয়ে গেছে। এই সমাপ্তির কবরে গার্গীকে এখন দিন কাটাতে হবে—মাসের পর মাস—বছরের পর বছর!

—বৌদি—বৌদি !

গার্গীর যেন ঘুম ভাঙল। কে ডাকছে এমন করে ?

চমকে সে পেছন ফিরে তাকালো। এদিকের জানালাটা দিয়ে দেখতে পাওয়া গেল পাশের বাড়ির একটা খোলা বারান্দায় কোথা থেকে একটি মেয়ে এসে দাঁড়িয়েছে।

গার্গীর সঙ্গে চোখাচোখি হতেই মেয়েটি হেসে ফেলল।

—তুমিই তো দীনেশদার বৌ—না ?

গার্গী বিস্মিত কৌতূহলে মাথা নাড়ল। মেয়েটি অপরিচিত—কিন্তু অপরিচয়ের কোনো সংকোচ নেই কোথাও। বছর ষোলো-সতেরোর একটি গোলগাল ফর্সা মেয়ে—হাসি আর আর আনন্দে চোখ মুখ উজ্জ্বল হয়ে আছে। গা-ভরা গয়না, কপাল আর সিঁথি জুড়ে সিমন্তিনীর সৌভাগ্য-ঘোষণা। মেয়েটি বললে, আমি আজ শ্বশুর বাড়ি থেকে এসেছি। ভেবেছিলুম, বিকেলে বৌ দেখতে আসব। তা ভালোই হল। আগে-ভাগেই আলাপ হয়ে রইল।

—কিন্তু আমি তো আপনাকে—

—বাঃ রে, কী করে চিনবে ? আমি মঞ্জু। বিয়ের দেড় বছর পরে প্রথম শ্বশুর বাড়ির থেকে ছুটি মিলেছে। সে-সব অনেক কথা।

—ওঃ !—কী বলা উচিত, গার্গী ঠিক করতে পারল না।

মঞ্জু বললে, তা পরে হবে ওসব। আজ বিকেলে আমি আসব, প্রাণ খুলে গল্প করা যাবে তখন। এখন যাই ভাই বৌদি—বাচ্চাটা বড্ড কাঁদছে—

গার্গীর আড়ষ্ট ভারী মনের ওপর বিদ্যুতের একটা ঝলক এঁকে মেয়েটি দ্রুত পায়ে অদৃশ্য হল।

—পাঁচ—

বিকেলে মঞ্জু যখন এল, তখন ভারী ভারী ছায়া নেমেছে দালানের আনাচে-কানাচে। বড় বড় ফার্ণিচার-ঠাসা ঘরগুলোর ভেতরে এখনো আলো জ্বালবার সময় হয়নি—প্রায়ান্ধকারের একদল কবন্ধ যেন গুঁড়ি মেরে বসে আছে তাদের মধ্যে। যেন দম আটকে আনতে চায়—বুকের ওপরে চেপে বসে।

ঝিকে নিয়ে একটু আগেই কোথায় বেরিয়ে গেলেন অন্নপূর্ণা—বিষণ্ণ বাড়িটায় গার্গী এখন একেবারে একা। যতক্ষণ হাতে কাজ থাকে, ততক্ষণ সময় কাটে এক রকম করে। এটার পরে ওটা, ওটার পরে সেটা। নিজেকে ভুলে থাকা চলে—মনের অস্তিত্বটাই মনে থাকে না; কিন্তু তারপরে যখন সময় আসে নিজের মুখোমুখি হয়ে নিঃশব্দে বসে থাকার—যখন এই বাড়ির বিসদৃশ ঘড়িটার আওয়াজ থেকে শুরু করে মুখখোলা গঙ্গার কলটার জলের কলধ্বনি পর্যন্ত অবিচ্ছিন্ন যন্ত্রণার গোঙানি বলে বোধ হতে থাকে—তখন? সেই তখন?

এই শ্বশুরবাড়ি। এখানে সব স্থবির, সমস্ত মৃত। এখানকার পুরু পুরু দেওয়ালের ওপরে কখন সূর্য উঠবে, কখন দিন কাটবে কিছুই জানা যাবে না; মাস আর বছরগুলো ঘরের একপাশে সঞ্চিত পুরোনো পঞ্জিকাগুলোর মতোই হলুদ আর বিবর্ণ হয়ে যেতে থাকবে, তারপরে হাতের ছোঁয়া লাগলেই ওদের পাতাগুলো যেমন গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে ঝরে যায়—একদিন জীবনও ঠিক অমনি করেই ঝরে পড়বে। কথাগুলো ভাবতেই গার্গীর সমস্ত ইন্দ্রিয় স্তব্ধ হয়ে আসে।

আর সব চাইতে তার ভয় করে এই বিকালকে, এই দিনান্তকে। এই মরা বাড়িটা আরো বেশি করে মরে যায়, পুরোনো বাড়ির পুরোনো চুণবালির ভেতর থেকে কেমন একটা মৃদু গন্ধ আসতে থাকে। ওই গন্ধটা কিছুতেই

সহ্য করতে পারে না গার্গী। কেমন বিষাক্ত, কেমন একটা নিঃশব্দ চক্রান্তের মতো মনে হয় তার।

ওই গন্ধের সঙ্গে সঙ্গে অবচেতন থেকে একটা দিনের স্মৃতি আবর্তিত হয়ে ওঠে। কেদারের সংকীর্ণ গলি। দু'ধারে জীর্ণ বাড়ির ভেতর দিয়ে কোনো-মতে পা ফেলে চলবার সঙ্গে গার্গী একদিন সেখানে গিয়েছিল দূর সম্পর্কের এক মাসিমার সঙ্গে দেখা করতে।

ভাঙা দরজার কড়া নাড়বার সঙ্গে সঙ্গেই একটা হিন্দুস্থানী চাকর কবাট খুলে দিলে। উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি, টকটকে লাল চোখের রঙ্, অদ্ভুতভাবে কাঁপছে তার ঠোঁটদুটো। অসংলগ্ন জড়ানো গলায় সে বললে, এখানে কেন এসেছেন? পালান, মাইজী পালান।

দুজনেই দু পা পিছু হটে গিয়েছিলেন সভয়ে। লোকটা কোনো কথা খুলে বলবার আগেই একটা অসহ্য অপরিচিত দুর্গন্ধ দুজনের মুখের ওপর এসে পড়েছিল কঠিন আঘাতের মতো। মনে হয়েছিল, কিছু একটা এখানে ঘটছে যা ভয়াবহ, যার কাছ থেকে যথাসম্ভব দূরে সরে যাওয়াই নিরাপদ।

লোকটা জড়িয়ে জড়িয়ে বলেছিল, বাড়ি ভর্তি পিলেগ, পালান, পালিয়ে যান—

'পিলেগ'—প্লেগ। কী বিভীষিকার তাড়ায় যে দুজনে ছুটতে ছুটতে হরিশ্চন্দ্র ঘাটের রাস্তায় এসে নেমেছিলেন সে কথা ভাবতে আজও শরীর হিম হয়ে আসে। গার্গীর মনে হয়, এ বাড়ির রন্ধ্রে রন্ধ্রেও তেমনি একটা কিছু আছে, তেমনি কোন নিঃশব্দ মহামারী, কোনো অপরিচিত প্লেগের ইঙ্গিত শরীরের ওপর তার সংক্রমণ হয়তো নেই; কিন্তু একটু একটু করে তা মনকে জড়িয়ে ধরে, আচ্ছন্ন করে আনতে থাকে।

বাবার কাছে আজ একটা চিঠি দেবে ভেবেছিল গার্গী, কিন্তু পারলনা। দু একটা লাইন লিখেই অবরুদ্ধ ঘরটার ভেতর থেকে সে বাইরে এসে দাঁড়ালো। ছায়া-ছড়ানো বাড়িটার ওপর যেটুকু আকাশ, একখণ্ড মেঘ থমকে আছে সেখানে। কিন্তু কেন ওরকম রঙ মেঘখানায়—কেন এমন রক্ত-পাণ্ডুর?

এমন সময় ডাক পড়ল : বৌদি ?

গার্গী ফিরে তাকালো। সেই মেয়েটি। মঞ্জু।

—আসুন, আসুন।

মেয়েটি একমুখ হাসল : গল্প করতে এলাম আপনার সঙ্গে।

—বেশ তো, ঘরে চলুন।—গার্গীও হাসতে চেষ্টা করল।

—কী হবে ঘরে। এই বারান্দাতেই বসা যাক —মেয়েটি মেঝেতে বসে পড়ল দেওয়ালে পিঠ দিয়ে।

—ওকি, মাটিতে বসলেন কেন ? একটা মাদুর পেতে দিই।

—আমার সঙ্গে ভদ্রতা ? ও বাবা—চোখ বড় বড় করলে মঞ্জু : বিয়ের আগে পর্যন্ত দিনের বেশির ভাগ সময় তো এ বাড়িতেই আমার কাটত। জানেন না আপনি ?

মেয়েটির কথার ধরণে ভারী মনটা প্রসন্ন হয়ে উঠতে লাগল : না। কী করে জানব ?

—তাইতো—মঞ্জু মাথা নাড়ল : কী করে জানবেন আপনি! মোটে সেদিন তো এলেন এই বাড়ীতে—মঞ্জু থামল, তার পর কিছুক্ষণ স্থির চোখে তাকিয়ে রইল গার্গীর দিকে: কিন্তু দীনেশদা সম্পর্কে আমার মত বদলাল এতদিন পরে।

দীনেশ! স্বামীর নামটা শোনবার সঙ্গে সঙ্গে গার্গীর সারা শরীরে যেন একটা ঝাঁকুনি লাগল। আনন্দের নয়, ভয়ের নয়—একটা অর্থহীন অস্বস্তির ছোঁয়ায় কুঁকড়ে আসতে চাইল তার হৃৎপিণ্ড।

গার্গী কথা বললে না।

শরীরটাকে একটুখানি দোলা দিয়ে মঞ্জু বললে, অন্তত আপনাকে বিয়ে করে দীনেশদা প্রমাণ করে দিয়েছে যে তার চোখ আছে। এখনো মাথার ভেতরটা তার লোহার কড়ি-বর্গার মতো জমাট হয়ে যায়নি।

আর, ঠিক তখন, বড়বাজারের লোহার গদীতে সিদ্ধিদাতা গণেশের কুলুঙ্গিতে ধুনো জ্বেলে দিতে দিতে কুঞ্চিত-ভ্রূ দীনেশ ফিরে তাকালো।

দোরগোড়ায় কোর্টফেরৎ মন্মথ দাশগুপ্ত দাঁড়িয়ে; শরীরটাকে সম্পূর্ণ ঘুরিয়ে দীনেশ মুখোমুখি হল মন্মথর।

—মানে কী হল কথাটার?

মন্মথ তখন কোটপ্যান্টশুদ্ধ দীনেশের গদীর ওপর বসে পড়েছে। তারপর তার ছোট তাকিয়াটা টেনে ঠেসান দিয়ে বললে, কোর্ট থেকে আসতে আসতে জিনিষটা হঠাৎ 'ফ্ল্যাশ' করল। ভাবলাম, এই বেলাই তোমাকে বলে যাই।

ভ্রূর ওপরে কুঞ্চন-রেখা টেনে রেখেই দীনেশ এগিয়ে এল মন্মথর কাছে। মন্মথর বসার ভঙ্গি দেখেই মনে হচ্ছে বেশ জাঁকিয়ে নিয়েছে এখন। আপাতত সহজে নড়বে না, বকর বকর করে জ্বালিয়ে মারবে অন্তত ঘণ্টাখানেক।

কিন্তু মন্মথর সঙ্গে পারবার উপায় নেই। শুধু বাল্যবন্ধুই নয়, উপকারও করেছে অজস্র। তা ছাড়া মন্মথর উকিলী বুদ্ধি পেছনে না থাকলে এত অল্প দিনের মধ্যে কারবারটার এত বেশি উন্নতি করতে পারত কিনা সন্দেহ। কয়েকটা মামলা-মোকর্দমায় মন্মথ যা করেছে, নিজের মায়ের পেটের ভাইও অতখানি করত না তার জন্যে।

না, অকৃতজ্ঞ নয় দীনেশ। তবু মন্মথকে সব সময়ে সহ্য করতে পারে না সে। খোঁচা দিয়ে কথা বলে মন্মথ, সুড়সুড়ি দিয়ে বিব্রত করে তোলে যখন-তখন; অথচ দীনেশ প্রতিবাদ করতে পারে না—উচ্চশিক্ষিত ক্ষুরধার বুদ্ধি মন্মথর কাছে নিজেকে অত্যন্ত দীন বলে মনে হয় তার।

মন্মথ বললে, আগে চা আনাও, সেই সঙ্গে কিছু খাবারও। এই মাত্র একটা বিদ্‌কিচ্ছিরি মামলার সওয়াল সেরে এসেছি।

একটা চাকরকে চা আর খাবারের পয়সা দিয়ে দীনেশ মন্মথর কাছে এসে বসল।

—রাস্তায় আসতে আসতে মনে হল—মন্মথ শুরু করলে: অন্তত বিয়ের ব্যাপারে দীনেশ প্রমাণ করেছে যে, ইস্পাত ছাড়াও আরো কিছু কিছু জিনিষের ভালোমন্দ সে বোঝে। বাস্তবিক ঈর্ষ্যা করবার মতো বৌ পেয়েছ তুমি!

ঠোঁটছুটো দীনেশের শক্ত হয়ে এল। ঈর্ষ্যা করবার মতো! পুঁথিপড়া পণ্ডিত বৌ! কাল সারারাত কাঁকড়া-বিছের বিষের মতো জ্বালায় সমস্ত শরীর জ্বলে গেছে তার। সুন্দরী, বিদুষী! না, ওর একটাও সে চায়নি।

কিন্তু কোনো কথা বললে না দীনেশ। মনের ব্যক্তিগত আবেগগুলোকে সহজে প্রকাশ করার অভ্যাস তার নেই। বাড়ীতে চাকর-বাকরের ওপর যতই সে হুঙ্কার ছাড়ুক, বাইরে সে অপরিমিত মাত্রায় মিতভাষী। কথা কিনতেই হয়, বেচতে নেই: ব্যবসায়ীর জীবনে এই মূলমন্ত্রটির দাম অনেক।

মন্মথ বললে, ভালো বৌ যখন পেয়েছ, তখন ভালো করে তার দাম তোমার দেওয়া উচিত।

—কি রকম?—তেমনি চাপা ঠোঁটে নিরুত্তাপ প্রশ্ন করলে দীনেশ।

—আরে বাপু, এও কি খোলসা করে বোঝাতে হবে? শুধু লোহাই বুঝেছ, আর কিছু বোঝোনি?

দীনেশ অল্প একটু কঠিন হাসি হাসল, সে হাসি লোহাতে ঢালাই করা: সে তো জানোই। কী বলতে চাও, বলো এখন।

চাকর চা আর গরম নিমকি নিয়ে এসেছিল। লুব্ধভাবে একখানা নিমকিতে কামড় দিয়ে মন্মথ বললে, তোমাকে বোঝাতে গেলে দস্তুরমতো মোহমুদ্গর দরকার। এখন দিনকয়েকের জন্যে ওই লোহার হিসেব বন্ধ করো দেখি বাপু!

—কী করব বন্ধ করে?

মন্মথ বললে, হনিমুন! মানে, মধু চাঁদ।

—অর্থাৎ?

মন্মথ বললে, কী ভয়াবহ জীব! মানুষ তো নয়, যেন একখানা লোহার সিলিণ্ডারের গায়ে কেউ মাথা মুখ হাত পা জুড়ে দিয়েছে। হনিমুনেরও মানে জানতে চায়! সোজা কথায় বলি, লোহার প্রেমালিঙ্গন ছেড়ে এবার অন্তত দিনকয়েকের জন্যে বেচারীর কথা ভাবো।

দীনেশ বললে, হু।

—হুঁ নয়, বলো, হাঁ! যদি কর্মচারীদের বিশ্বাস করতে না পারো, না হয় দিনকয়েক দোকান বন্ধই থাকল! তারপর স্ত্রীকে নিয়ে একটু থিয়েটার-—টিয়েটার দেখাও, জন্তুর বাগানে নিয়ে যাও—

থিয়েটার!—দীনেশ ঘৃণায় মুখ কুঞ্চিত করলে: ঘরের বৌকে নিয়ে বাই নাচ দেখতে তোমাদের হয়তো ভালো লাগে ভাই, কিন্তু সকলের সেটা ধাতে সয়না। তা ছাড়া, খামোকা চিড়িয়াখানায় গিয়ে কতগুলো বাঘসিঙ্গী দেখে সময় নষ্ট করার কী দরকার আছে তাও আমি ভেবে পাই না!

চায়ের কাপে একটু চুমুক দিয়ে পেয়ালাটা নামিয়ে রাখল মন্মথ: তা বটে! তোমার মতো নমুনা যখন ঘরের মধ্যেই রয়েছে তখন কষ্ট করে জন্তুর বাগান দেখতে না গেলেও চলে? এক তোমাকে দেখলেই 'জুলজির' বিশ্বরূপ দর্শন ঘটে। আচ্ছা, প্রস্তাবের ও অংশটা আমি প্রত্যাহার করছি। কিন্তু থিয়েটার মানে কি বাই নাচ? এই তো কত ধর্মমূলক বই হচ্ছে—বিল্বমঙ্গল, হরিশ্চন্দ্র, তপোবল—

দীনেশ মুখ বিকৃত করলে: ধর্মমূলক বই! আহা সতীসাধ্বীর দল সব! থিয়েটারের নামে যত নষ্ট মেয়েছেলের হৈ-হল্লা! ও সব লোভ আমাকে দেখিয়োনা। আর আমাকে যা খুশি তা বলতে পারো মন্মথ, কিন্তু আমাদের বাড়ীর বৌ ফিটন গাড়ী চড়ে কোনোদিন থিয়েটার দেখতে যাবে না, এ-ও তুমি জেনে রেখো।

—কী করবে তা হলে? তুমি তো লোহা নিয়ে রইলে। বেচারা ছেলেমানুষ বৌয়ের দিন কাটবে কী করে?

দীনেশ সংক্ষেপে বললে, ঘরের কাজ করে।

একটা দীর্ঘনিশ্বাস চাপল মন্মথ: তা হলে একটা বুদ্ধি দিচ্ছি তোমাকে। রোজ সকালে মণখানেক করে গোবর কিনে দিয়ো বাড়িতে।

—গোবর? কী হবে?

—তোমার বৌ ঘুঁটে দেবে। লোহার ব্যবসার সঙ্গে একটা ঘুঁটের

দোকানও খোলো, একেবারে ফলাও কারবার চলতে থাকবে। অনর্থক বসিয়ে খাওয়াবে কী জন্যে ?

—আমিও তাই ভাবছি—অন্নপূর্ণা বললেন বাচস্পতিকে।

কাল থেকেই একটা প্রচ্ছন্ন অনুতাপের কাঁটা অন্নপূর্ণাকে পীড়ন করছিল। ভুল করলেন তিনি ? অগ্রপশ্চাৎ না ভেবে, দীনেশের মনের দিকটা একটুকুও বিচার না করে, গার্গীকে ঘরে আনাটা একটা বিপর্যয়ের সূচনা নয় তো ? তুলসীঘাটের গঙ্গার ধারে কিংবা তিলভাণ্ডেশ্বরের মন্দিরে যাকে মানায়—দীনেশের বাড়িটা কি তার পক্ষে যথাস্থান ?

সবটা শুনে বাচস্পতি মাথা নাড়লেন : হুঁ, ব্যাপারটা আমি বুঝতে পারছি। কিন্তু যা হওয়ার সে তো হয়েই গেছে। এখন আপনাকেই দুদিক মানিয়ে চলতে হবে। দীনেশকে বোঝাতে হবে, আর দেখতে হবে বৌও যেন ওর মতো করে এক আধটু নিজেকে তৈরী করে নেয়। তবে সব দায়িত্বই আপনার। এই বিয়ে তো আপনার ঝোঁকের উপরেই হয়েছে।

—তাই তো ভাবছি—আবার বললেন অন্নপূর্ণা। কিন্তু দায়িত্ব কি আজ পর্যন্ত তিনি নিয়েছেন ? স্বামী ছিলেন সদাশিবের মতো ভালো মানুষ, স্ত্রীকে অত্যন্ত সম্মান করে সন্তর্পণে দিন কাটিয়ে গেছেন। অন্নপূর্ণা যা বলেছেন, তাই তিনি করেছেন। আর দায়িত্ব যা কিছু—নিঃশব্দে বহন করে গেছেন—টেরও পান নি অন্নপূর্ণা।

দায়িত্ব যখন নেবার সুযোগ ছিল, তখনই নেন নি ; আর আজ নিতে পারবেন ? নিতে পারবেন দীনেশের এই রাজত্বে ? কঠিন, সরল মানুষ দীনেশ। তার ব্যক্তিত্বের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে কি একটি কথা বলবার মতো সাহসও তাঁর আছে ? কিন্তু বাচস্পতিকে কী করে বলা যাবে সে কথা ?

বাচস্পতি বললেন, তবে ওটা এমন বিশেষ কিছু নয়। বৌমাকে যা দেখলাম, খুবই বুদ্ধিমতী। উনিই শুধরে নিতে পারবেন সব।

—আমারও সেই ভরসা—অন্নপূর্ণা জবাব দিলেন। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে পড়ে বললেন, আজ তবে যাই, সন্ধ্যে হয়ে এল।

ঝিকে নিয়ে এসে অন্নপূর্ণা রিক্সায় উঠলেন। কিছুতেই স্বস্তি পাচ্ছেন না। বুদ্ধিমতী মেয়েই বটে! সেই জন্যেই ভয়টা তাঁর আরো বেশি। একটা সাধারণ ধারণা আছে মানুষের যে, বুদ্ধি থাকলেই সব কিছু সহজ করে নেওয়া যায়। কিন্তু অন্নপূর্ণার খটকা লাগে। বুদ্ধি থাকলেই আসে বিচার, আর বিচার এলেই আরো দুরূহ হয়ে ওঠে মানানোটা। সহজেই সব যে বোঝে, চোখ বুজে থাকাটা তার পক্ষে অসম্ভব। বুদ্ধি দিয়ে কষ্ট করে বোঝা যার অভ্যাস—মনের বোঝাটা তারই ওপরে চেপে থাকে ভারী হয়ে।

গার্গীর মুখে সেই বুদ্ধির দীপ্তি দেখেছিলেন বলেই ভয়টা এমন করে চেপে ধরেছে অন্নপূর্ণাকে। আর দীনেশ? খাঁটি ব্যবসায়ীর মতো হিসেবের একটা কানাকড়িও তো ছাড়তে সে রাজী নয়।

অন্নপূর্ণা ঝিকে বললেন, ভাবছি আর একবার কাশী যাব। এখানে আর ভালো লাগছে না।

—তুমি মন খারাপ কোরোনা বৌদি—মঞ্জু সহানুভূতিভরা গলায় বললে, যে কদিন আমি আছি, রোজই একবার আসব।

ছোট একটা নিঃশ্বাস ফেলল গার্গী। তাকালো আকাশের দিকে। মাথার ওপরকার রক্ত-পাণ্ডুর মেঘখানা নিঃশব্দে কখন কালো হয়ে গেছে—একাকার হয়ে যাচ্ছে সন্ধ্যার অন্ধকারের সঙ্গে।

—তাহলে তো বাঁচি ভাই—অনিচ্ছাসত্ত্বেও গার্গীর গলা কেঁপে উঠল একবার। মঞ্জু বললে, বই পড়তে ভালোবাসো তুমি?

—বই? আছে তোমার কাছে?—যেন জলে ডুবতে ডুবতে হঠাৎ হাতের কাছে ভাঙা আঁকড়ে ধরলে গার্গী: তুমি দিতে পারবে আমাকে?

—সে রকম ভালো বই তো কিছু নেই, তবে মাসিক পত্র আছে অনেকগুলো।

—তবে তাই এনে দিয়ো ভাই। কিছু পড়তে না পেয়ে আমি হাঁপিয়ে উঠেছি।

—আচ্ছা, কাল দুপুরেই এনে দেব। আসি আজ, কী বলো?

—এসো ভাই—অন্ধকার ছড়ানো কালো ঘরগুলোর দিকে তাকিয়ে আর একটা নিঃশ্বাস ঝরে পড়ল গার্গীর। অন্নপূর্ণা এখনো এলেন না। এই ঘর-গুলোকে একা একা তার পাহারা দিতে হবে। আরো কতক্ষণ—কে জানে!

আঁচলটা তুলে নিয়ে মঞ্জু উঠে দাঁড়ালো।

বারান্দার আলোটা জ্বেলে দিয়ে গার্গী বললে, কাল কিন্তু মনে করে পত্রিকাগুলো এনো ভাই। আর বেশি করে এনো। আমি খুব তাড়াতাড়ি পড়তে পারি।

—সে আমি তোমায় দেখেই বুঝতে পেরেছি।—মঞ্জু হাসল: আচ্ছা, এক বাণ্ডিল এনে ফেলে দিয়ে যাবো। অনেকগুলো জমে আছে বাড়িতে।

মঞ্জু চলে গেল।

দীনেশের ঘরের বড় ঘড়িটা হঠাৎ সজাগ হয়ে উঠল। একটানা শব্দের ভেতর আচমকা সেটা বিশ্রী ভাবে ঘড়্ ঘড়্ করে উঠল, তারপর তীব্র তীক্ষ্ণ-স্বরে ঢং করে আওয়াজ উঠল একটা। ওই বেমানান আকস্মিক শব্দটা ভয়ের একটা ঢেউ তুলিয়ে দিলে গার্গীর রক্তের ভেতরে!

আর, তখুনি চমকে বুকপকেট থেকে ঘড়িটা বের করে দেখল মন্মথ।

—অ্যাঁ, সাড়ে ছ'টা। কী সর্বনাশ! তোমার সঙ্গে বকে বকে অনর্থক সময় নষ্ট করলাম এতক্ষণ! এখুনি যেতে হবে আমাকে—বৌকে নিয়ে দেখতে যাব মিশরকুমারী। কথা দিয়ে এসেছি—বিপর্যয় কাণ্ড হবে নইলে।

—মিশরকুমারী?—ভ্রূ কুঁচকে জিজ্ঞেস করলে দীনেশ।

—থিয়েটার—থিয়েটার!—মন্মথ হাসল: তোমার মতে বাই নাচ। আচ্ছা, উঠি তবে।

অত্যন্ত তড়বড়ে গতিতে রাস্তায় নেমে গেল মন্মথ। আর ক্যাশবাক্সটাকে কোলের কাছে নিয়ে প্যাঁচার মতো একটা অদ্ভুত গোলালো চোখে দীনেশ তাকিয়ে রইল তার দিকে।

—ছয়—

একরাশ মাসিকপত্র তো নয়—যেন এক ঝাঁক পাখি উড়ে এল ঘরে। নিয়ে এল নিঃসীম আকাশকে, পাহাড় ছাওয়া শালবনকে, ঢেউ ভাঙা সমুদ্রকে। গল্প-কবিতা-প্রবন্ধ-উপন্যাস-নাটক। মৈত্র-বাড়ির নিঃসঙ্গ অন্ধকূপের দশ দিকে খুলে গেল দশটা জানালা—হাজার মানুষের হাজার মন গার্গীর মনের ভেতর আনাগোনা শুরু করল।

যেটুকু সময় দীনেশ বাড়ীতে থাকে, গার্গী সে সময়টা কাগজগুলো দীনেশের দৃষ্টির বাইরেই সরিয়ে রাখে। বুঝতে বাকি নেই, ওগুলো সে সহ্য করতে পারবে না। পড়তে দেখলে হয়তো ক্ষেপে উঠবে, চিৎকার আরম্ভ করে দেবে রূঢ়তম ভাষায়—রুক্ষতম ভঙ্গিতে। দোকানে ফিরে গিয়ে তার লোহার হিসেব মিলবে না, অনর্থক গালমন্দ খেয়ে মরবে নিরীহ কর্মচারীর দল।

ক'দিন থেকে অন্নপূর্ণা কেমন এড়িয়ে এড়িয়ে চলেন। যেন লজ্জা পান—কোথায় একটা অপরাধ অনুভব করেন। তাঁর মনোভাবটা খানিক আন্দাজ করে নিতে পারে গার্গী। যে জোর খাটিয়ে বৌকে অন্নপূর্ণা ঘরে এনেছেন, সেই জোর দিয়ে তাকে আর রক্ষা করতে পারছেন না। হয়তো ধারণাও করতে পারেননি—দীনেশের ব্যক্তিত্বটা এত প্রচণ্ড, তার রুচি এতখানি আপোষহীন। লোহার কারবারী দীনেশকেই অন্নপূর্ণা চিনতেন,—কিন্তু সংসারী দীনেশকে তিনি ধারণা করতে পারেননি।

গার্গীর বরং সহানুভূতি হয় অন্নপূর্ণার জন্যে। আরো বেশি সহানুভূতি হয়, যখন তাকে দেখলে অন্নপূর্ণা জপের মালায় হাত দিয়ে একেবারে তন্ময়

হয়ে যান। আগে তাঁর জপ-তপের একটা বাঁধা সময় ছিল, এখন যেন চব্বিশ ঘণ্টাই তিনি গোসাঁই-মন্ত্র জপ করে চলেছেন।

যেটুকু কথা হয়—তা নিছক সাংসারিক। নেহাৎ বলতে হয়, তাই বলা; না বললে চলে না, সেইজন্যেই বলা।

—এ বেলার রান্না বের করে দিয়েছ বৌমা?

—হাঁ মা, দিয়েছি। আপনি একবার দেখবেন না?

—আমি আর কী দেখব, সব ঠিক আছে।

—তবু একবার—

—কিচ্ছু দরকার নেই বৌমা। যতদিন তুমি ছিলে না, ততদিন দেখেছি। এখন তোমার সংসার, তোমার সব। তুমি যা করবে তাই হবে। আমাকে আবার মিছিমিছি ওসবের মধ্যে টানো কেন?

তোমার ঘর, তোমার সংসার! জোর দিয়ে বলেন অন্নপূর্ণা—সম্পূর্ণ বিশ্বাস করেন না বলেই প্রাণপণে গার্গীকে বিশ্বাস করাতে চান। গার্গী জানে, এ বাড়ির ভারী ভারী ফার্নিচারগুলোর যদি প্রাণ থাকত, তা হলে তাদেরও এই কথা বলেই অন্নপূর্ণা সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করতেন। কে জানে—হয়তো গার্গীর চাইতেও অন্নপূর্ণা বেশি করুণার পাত্রী!

এই অসহ্য মুহূর্তগুলোর ভার খানিকটা লাঘব করে দিয়েছে মঞ্জু এসে। শুধু নিজে আসেনি, তার সঙ্গে এনেছে এই পত্র-পত্রিকাগুলোকেও। তাড়াতাড়ি করে পড়ে ফেলতে সাহস হয় না গার্গীর। কৌতূহল যেখানে সব চেয়ে বেশি উদগ্র হয়ে ওঠে, হয়তো সেখানেই সে পাতাটাকে ভাঁজ করে রাখে। একটা গল্পকে দুবার তিনবার করে পড়ে। যদি এরা দু'চারদিনের মধ্যেই ফুরিয়ে যায়, তবে কী নিয়ে কাটবে তার সময়—কেমন করে পার হবে অসহ্য মন্থর দিনগুলো?

মঞ্জু এল।

খাটের ওপর ঝুপ করে বসে পড়ে রুষ্ট মুখে মঞ্জু বললে, সব আমার শাশুড়ীর নষ্টামি। আসবার সময় দিব্যি সোনা মুখ করে বললে, মাসখানেক

বাপ-মার কাছে থেকে এসো বৌমা। আর দশদিন যেতে না যেতেই চিঠি লিখছে, বাতের জ্বালায় আমি শয্যাশায়ী—বৌমা না এলে খোকার বড্ড কষ্ট হচ্ছে!

পাংশু মুখে গার্গী বললে, আজই যাবে?

—কী করব? পর পর তিনখানা চিঠি দিয়েছে। তুমি জানো না ভাই, কী বিচ্ছিরি মুখ আমার শাশুড়ীর। দিনরাত কঁ্যাট কঁ্যাট করছে। আমি সামনে নেই, বকাঝকা করতে পারছে না, তাই বোধ হয় মুখ ব্যথা করছে।—মঞ্জু বিড় বিড় করতে লাগল: এত যে বাতে ভুগছে, মরেও না ছাই।

ছিঃ ছিঃ!

মঞ্জু হাসল: মিথ্যে তুমি ছি ছি করছ বৌদি—আমার শাপমন্যিতে ওর কিছু হবে না। ওর পাকা হাড়—সহজে মরবে? আমাকে জ্বালিয়ে—ভাজা ভাজা করে তবে যাবে।

গার্গী নিঃশব্দে শুনতে লাগল।

মঞ্জু বললে, তবে আমিও একটা বুদ্ধি করেছি।

গার্গী চোখ তুলে তাকালো।

—ওকে বলে বলে কলকাতায় ট্রান্‌স্‌ফার নেওয়াবার চেষ্টা করছি। প্রায় হয়েও এসেছে—হয়তো বছর খানেকের মধ্যেই বদলির হুকুম হয়ে যাবে। তখন আর আমায় পায় কে? যখন খুশি বাপের বাড়িতে আসতে পারব, যতদিন খুশি থাকতে পারব। উনি তো মাটির মানুষ, একটা কথাও বলবেন না।

শেষ কথাটায় চমকে উঠল গার্গী, আর একবার যেন ঘা খেল নতুন করে। ঘরের ম্লান আলোতেও স্পষ্ট দেখতে পেল, আনন্দে আর সুখে মঞ্জুর গাল দুটো রাঙা হয়ে এসেছে—তার দুই চোখে স্বামী-সৌভাগ্য দুটি দীপশিখার মতো জ্বলে উঠছে। গার্গীর মনে হল, তার এত বেশি কাছে থেকেও এই মুহূর্তে মঞ্জু অনেকখানি দূরে সরে গেছে—তাদের দু-জনের মধ্যে প্রসারিত হয়ে আছে একটা বহুব্যাপ্ত ব্যবধান। আর—আর সেই ব্যবধানকে গার্গী কোনোদিন পার হয়ে যেতে পারবে না, কোনোদিনই না!

অতলের অন্ধ-গহ্বরে ডুবে যাওয়ার শেষ মুহূর্তে যেন গার্গী নিজেকে ওপরে টেনে তুলল। জোর করে মুখের ওপরে জাগিয়ে তুলল হাসির রেখা: কিন্তু ছেলে কলকাতায় বদলি হলে শাশুড়ীও তো সঙ্গে আসবেন!

—না, তা আসবে না। পশ্চিমে থেকে থেকে বুড়ির এমনি অভ্যেস হয়ে গেছে যে, বাংলা দেশের নামেই ভয় পায়। ধারণা হয়েছে, এখানে এলেই ভিজে হাওয়া-মাটিতে ওর বাত বেড়ে যাবে। তা ছাড়া মজঃফরপুরেই তো সব। বড় ভাসুর ওখানে ব্যবসা করেন, শ্বশুরবাড়ির তিনপুরুষের ভিটে। সে ভিটে ছেড়ে বুড়ি কিছুতেই নড়বে না দেখে নিয়ো।

—যাক, তোমার সুদিন তা হলে আসছে—গার্গী আবার হাসতে চেষ্টা করল।

—সেই ভরসাতেই তো আছি—মঞ্জু উঠে পড়ল: যাই ভাই এখন, সব আবার গুছিয়ে গাছিয়ে নিতে হবে তো। যাওয়ার আগে দেখা করে যাব।

হতাশ কণ্ঠে গার্গী বললো, তোমার বইগুলো—

—কী হবে?—মঞ্জু বললে, বাড়িতে কেউ পড়ে না। মাসে মাসে আসে, ঘরের কোণে জমা হয়, নেংটি ইঁদুরে কুটি কুটি করে কাটে। তুমি তো এত পড়তে ভালোবাসো, ওগুলো বরং তোমার কাছেই থাক।

কৃতজ্ঞতায় গার্গীর চোখ ছলছল করে উঠল: তুমি আমায় বাঁচালে ভাই—কী আর বলব। যাওয়ার সময় একবার দেখা করে যাবে তো?

—যাব বইকি, নিশ্চয় যাব—মঞ্জু বিদায় নিলে।

গার্গী চুপ করে বসে রইল। বেদনায় সারা মনটা বিস্বাদ হয়ে গেছে। দুদিনের জন্যে মেয়েটা এসেছিল—সময়ে-অসময়ে এ-বাড়ির দুর্বহ ভারটা লাঘব করে দিয়ে যেত। আজ সেও চলে গেল।

কিন্তু যাক। হয়তো মঞ্জুকেও বেশিদিন সহ্য করতে পারত না গার্গী। প্রখরা শাশুড়ী—দিনরাত বকবক করে। কিন্তু সেজন্যে তো ওর স্বামী-সৌভাগ্যে এতটুকু আঁচড় পড়েনি, ওর আনন্দিত পরিতৃপ্ত মুখে কোথাও এতটুকুও ছায়া এঁকে দেয়নি! স্বামী! সমস্ত দুঃখ, সমস্ত ক্ষয়-ক্ষতির ওপর

স্নেহ-প্রেমের একটা নিবিড় প্রলেপ বুলিয়ে দিয়েছে, তাহার বাহুর আশ্রয়ে পৃথিবীর সমস্ত তুচ্ছতাকে ভুলে যেতে পারে মঞ্জু!

আর গার্গী?

জ্বালাধরা চোখ মেলে গার্গী ভাবতে লাগল: চলে যাক—সামনে থেকে চলেই যাক মঞ্জু। দিনের পর দিন নিজের মনের মধ্যে বিষাক্ত ঈর্ষ্যা ফেনিয়ে উঠবে গার্গীর; মঞ্জুর প্রতিটি সুখের কথা এক একটা নিষ্ঠুর কঠিন অঙ্কুশের খোঁচার মতো ওকে পীড়ন করতে থাকবে, রক্তাক্ত করে তুলবে ওকে। অন্ধকারটা যদি বা কোনোদিন সরে যায়—তার মাঝখানে আলোর ঝলক আরো বেশি করে দুঃখ দেবে। হয়তো— একটা আকস্মিক শিহরণের সঙ্গে গার্গী ভাবতে লাগল: বিশ্বাস নেই মনকে, বিশ্বাস নেই নিজের দুর্বলতাকে। কে জানে, আহত ঈর্ষ্যায় কোনো দুর্বল মুহূর্তে সে মঞ্জুকে অভিশাপ দেবে কি না—কোনো একটা অসতর্ক অবসরে কামনা করে বসবে কিনা, তারই মতো মঞ্জুর মুখ থেকেও সুখের হাসি নিশ্চিহ্ন হয়ে মুছে যাক!

তীব্র অস্বস্তিতে ছটফট করে উঠে দাঁড়াল গার্গী। চলে যাক—সামনে থেকে চলেই যাক মঞ্জু।

মঞ্জু চলেই গেল। যাবার আগে চোখের জল মুছে ফেলে বললে, ভুলো না কিন্তু বৌদি ভাই। ঠিকানা রেখে গেলাম, চিঠি দিয়ো।

গার্গী ঘাড় নাড়ল। কিন্তু সত্যি সত্যিই চিঠি দেবে? ভাবতে ভরসা হয় না। কে জানে, তাতেও দীনেশ অপরাধ নেবে কি না!

আবার নিঃসঙ্গ দিনের পালা। আবার অবরুদ্ধ ঘরে মুমূর্ষু ঘড়িটার ঘড়ঘড়ানি—আবার বাড়িময় অনড়-অটল একরাশ কালো কালো কঠিন ছায়া। আবার মৃত-মন্থর মুহূর্তগুলো নিয়ে দুঃসহ দিন-গণনার পালা। শুধু ওদিকে জানালাটা দিয়ে বন্দিনী গঙ্গার দিকে তাকালে কোথায় যেন একটা মানসিক সাধর্ম্য পাওয়া যায়। তুলসীঘাটের নীল নির্মল গঙ্গা এখানে বুকভরা ঘোলা ময়লা জল নিয়ে পাথর-বাঁধানো দু-পাড়ে মাথা ঠুকে মরছে; তারও বুকের

ভেতরে কঠিন কাঁটার মতো বিঁধে আছে লোহার বয়াটা—গার্গীর মতো সেও মরে গেছে, সেও ফুরিয়ে গেছে এখানে এসে। তার ঘাটে ঘাটে ছত্রের নিচে এখানে ভজন গানের ঝঙ্কার উঠবে না, তাকেও আর হাতছানি দিয়ে ডাক দেবে না ওপারের দিগন্ত-বিস্তার অরহড়ের ক্ষেত। শুধু তার যন্ত্রণা-কাতর দেহটার ওপর কল-কারখানার প্রলম্বিত ছায়া পড়বে—ম্যানহোলের দুর্গন্ধ জলে প্রতিদিন সে বিষাক্ত হয়ে চলবে।

আজকাল তাই আর ও জানালাটার সামনে দাঁড়াতে পারে না গার্গী। ওই গঙ্গার দিকে তাকালে কেমন একটা অসহ্য কষ্ট হয় তার। ওই গঙ্গাই যেন কিছুতে তাকে ভুলতে দেয় না—নিজের কাছে নিজেকে সারাক্ষণ নির্মম-ভাবে সজাগ করে রাখে।

কৃপণের ধনের মতো আবার একটা পত্রিকা খোলে। ধীরে ধীরে সমস্ত ব্যগ্র কৌতূহলকে দমন করে এক একটা লাইনকে দু'বার তিনবার করে সে পড়ে। তাড়াতাড়ি ওদের ফুরিয়ে দেওয়া যেতে পারে না—যতদিন সম্ভব ওইটুকু আলো-হাওয়াকে সম্বল করেই তাকে মুক্তির নিঃশ্বাস ফেলতে হবে।

পড়তে পড়তে একদিন এক জায়গায় এসে গার্গী যেন হোঁচট খেল একটা। মাত্র দু'মাস আগেকার একখানা কাগজ। সেই কাগজে একটা ঘোষণা আছে।

বিশেষ কিছু নয়! নতুন লেখক-লেখিকাদের উৎসাহ দেবার জন্যে পত্রিকার কর্তৃপক্ষ একটা প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করেছেন। বিষয়, ছোট গল্প। যে লেখাটি সর্বশ্রেষ্ঠ হবে, সেটি যে কেবল কাগজে প্রকাশ করা হবে তাই নয়, লেখককে একশো টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে।

তারিখটা দেখল গার্গী। আরো প্রায় পনেরো দিন সময় আছে।

ঠিক। এও তো একটা পথ আছে। দীনেশ নিজের কাজ নিয়ে থাকুক—গার্গী অন্তত সময় কাটাবার জন্য একটা উপায় খুঁজে নিক। সে লিখবে, আবার লেখা শুরু করবে। কাশীতে থাকতে পশ্চিমের দু একটা বাংলা কাগজে কিছু কিছু লেখা তার ছাপা হয়েছিল, সুখ্যাতিও করেছিল

কেউ কেউ। এখনও তো সে অবসর মতো লেখার চর্চা করতে পারে—নিজের ভেতরে সাহিত্যের একটা পৃথিবী সৃষ্টি করে নিয়ে সেখানেও আশ্রয় পেতে পারে সাময়িকভাবে। দীনেশ জানবে না, নিভৃতে নিঃশব্দে সাধ্য মতো লেখার সাধনা করে চলবে সে।

ঘোষণার দিকে তাকিয়ে রইল গার্গী। আস্তে আস্তে একটা লুব্ধতা এসে তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলতে লাগল। হারিয়ে গেল এই বাড়ি—দীনেশের এই শাসন। শিবালয়ে সেই পড়বার ঘরটি—চন্দ্রশেখর সান্ন্যালের সেই প্রসন্ন উজ্জ্বল মুখখানা যেন চোখের সামনে ভাসতে লাগল।

—রাস্কিন কী বলেছেন জানিস? বলেছেন, মনে রেখো, আজ পর্যন্ত যে কথা কেউ বলেনি, সে কথা তোমাকে বলতে হবে; যে সত্য কেউ আবিষ্কার করতে পারেনি সেই সত্যকে আবিষ্কারের দায়িত্ব তোমার।

গার্গী পত্রিকাটা বন্ধ করে সরিয়ে রাখল। টেবিলের টানা থেকে বের করল কাগজ কলম। তারপর কিছু লেখবার আগে আত্মমগ্ন বিভোর চোখ মেলে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল দেওয়ালের সেই পুরোনো ঘড়ঘড়ে ঘড়িটার দিকে।

*　　　*　　　*

সোল্লাসে মন্মথ বলছিল, আমি বাজী রাখছি দীনেশ, এ তোমার বৌয়ের লেখা। শুধু নামেই মিলছে তা নয়—হুবহু তোমার বাড়ির বর্ণনা। আর স্বামীটির ক্যারাক্টার যা দিয়েছে, যেন তোমার নিখুঁত ফটোগ্রাফ।

দীনেশ এমন করে তাকিয়ে রইল যেন স্বরযন্ত্রে পক্ষাঘাত হয়েছে। কথা বলতে পারছে না, শুধু একটা বোবা যন্ত্রণায় চোখ দুটো ঠিকরে বেরিয়ে আসছে তার। যেন এখনো আশা করে আছে এ কথাগুলো নিছক স্বপ্ন—ঘুম ভাঙলেই এদের আর অস্তিত্ব থাকবেনা।

মন্মথ আবার বললে, ইচ্ছে করলে একবার বাড়ি থেকে ভেরিফাই করে আসতে পারো, কিন্তু তার দরকার হবে না।—দীনেশের পিঠে সশব্দে একটা চড় বসালো সে: খাওয়াও হে, খাওয়াও! লোহার ব্যবসা করে

ঘরে তুমি লক্ষ্মীই বেঁধেছ, কিন্তু সরস্বতীও যে এমন করে তোমায় অনুগ্রহ করবেন কে জানত! তুমি ট্রাডিশন ভাঙলে। লেখাটা শুধুই যে ফার্স্ট তা নয়, এরকম গল্প যে লিখতে পেরেছে, একদিন বাংলা সাহিত্যে তাকে লোকে এক ডাকে চিনবে।

পত্রিকাটি মুঠোর মধ্যে তেমনি আঁকড়ে ধরে মূঢ়ের মতো বসে রইল দীনেশ।

মন্মথ বললে, তা হলে আজ রাত্রেই হোক। মাংস আর পোলাও। তোমার বৌয়ের হাতের রান্না। সন্ধ্যেবেলাই গিয়ে হাজির হব—আজ আর ছাড়ব না।

কিন্তু এতক্ষণে নড়ে উঠল দীনেশ। আচমকা সমস্ত বিমূঢ় জড়তাটাকে কাটিয়ে উঠে দাঁড়াল ক্ষিপ্রবেগে। তারপর দোকান থেকে লাফিয়ে পড়ল রাস্তায়। তার দু চোখে হত্যাকারীর রক্তিমা!

মন্মথ চকিত হয়ে বললে, আরে, আরে, অমন পাগলের মতো ছুটছ কোথায়?

দীনেশ জবাব দিল না। পত্রিকাটা মুঠোর মধ্যে মুচড়ে নিয়ে সে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে চলল। শরীরের শিরাগুলোর মধ্যে যেন গোখরো সাপের বিষ জ্বলছে, মাথার ভেতর শুধু আগুনের মতো দপ দপ করে উঠছে একটি মাত্র সংকল্প: খুন করবে—গার্গীকে সে খুন করবে।

—সাত—

চটির শব্দটা এমনভাবে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে লাগল যে মনে হল এই পুরোনো বাড়ির প্রতিটি ইট-পাথর, প্রত্যেকটি কড়ি-বরগা শুদ্ধ থর থর করে কাঁপছে। ভারী থামের মাথার ওপরে বাসা-বেঁধে-থাকা চড়ুই জোড়া কিচ কিচ করে উড়ে গেল, পোষা বেড়ালটা রেলিং টপকে লাফিয়ে পড়ল পাশের দালানের কার্নিশে।

দরজা ভেঙে একটা খুনে-পাগল অন্ধ জিঘাংসায় বেরিয়ে এলে যেমন দেখায়—এখন ঠিক সেই রকম দীনেশের মূর্তি! বোতামখোলা বেনিয়ানের ভেতর থেকে আত্মপ্রকাশ করেছে রোমশ বুক, শাদা গোলাটে চোখদুটো নিষ্পলক, কোঁচকানো কপালের নিচে মোটা ভ্রূ দুটো জুড়ে গেছে একসঙ্গে। চাপা নাকটা উত্তেজিত নিঃশ্বাসে-প্রশ্বাসে ক্রুদ্ধ ব্যাংয়ের মতো একবার সঙ্কুচিত একবার প্রসারিত হচ্ছে।

দোতলায় উঠেই সামনেকার একটা ছোট জলচৌকিতে সজোরে লাথি মারল দীনেশ। জলচৌকিটা ছিটকে একটা টিপয়ের ওপরে গিয়ে পড়ল, সেখান থেকে একটা কাচের গ্লাস মেঝেতে উল্‌টে পড়ে তীক্ষ্ণ আর্তনাদে গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে গেল।

ঘরের ভেতর আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুল আঁচড়াচ্ছিল গার্গী। এই আকস্মিক শব্দ-তরঙ্গে চমকে উঠে যখন মুখ ফিরিয়ে তাকালো, তখন দরজার চৌকাঠের ওপর চোট্-খাওয়া বাঘের মতো দীনেশ দাঁড়িয়ে।

দীনেশের মূর্তি অনেকবার অনেক রকম দেখেছে গার্গী, কিন্তু এ রূপ সম্পূর্ণ অপরিচিত। একটা স্বাভাবিক সংস্কারেই যেন বুঝতে পারল এই মুহূর্তে কোনো অসাধ্য কাজ নেই দীনেশের। এখন সে দেওয়ালের বড় ঘড়িটাকে টেনে নামিয়ে মেজের ওপর আছড়ে ফেলতে পারে—গার্গীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে দুটো ঘাতকের থাবা বসিয়ে দিতে পারে তার গলায়।

কয়েক সেকেণ্ডের বজ্রগর্ভ স্তব্ধতা দুজনের মাঝখানে স্থির হয়ে রইল। শুধু ঘড়িটা কাঁপা কাঁপা অদ্ভুত গলায় সময় গুণতে লাগল, শুধু দীনেশের উত্তেজিত নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস মুমূর্ষুর শ্বাসটানার মতো ঘরটাকে আচ্ছন্ন করে রাখল। আসন্ন প্রলয়ের জন্যে অপেক্ষা করতে লাগল গার্গী।

কথাটা আরম্ভ করবার আগে বারকয়েক দম নিলে দীনেশ। তারপর ভূমিকা শুরু করতে গিয়ে পত্রিকাটা ছুঁড়ে ফেলল গার্গীর গায়ের ওপর।

হতবাক বিস্ময়ে গার্গী পত্রিকাটা কুড়িয়ে নেবে কিনা বোঝবার আগেই দীনেশ গর্জে উঠল: এই কাগজে গল্পটা কার লেখা? 'নববধূ'?

ভয় ভুলে গিয়ে আনন্দে কৌতূহলে গার্গী চমকে উঠল: বেরিয়েছে বুঝি?

সন্দেহের বাষ্পমাত্র আর রইল না!

তখনি গার্গীকে আক্রমণ করা উচিত ছিল দীনেশের। কিন্তু চরম মুহূর্তে পৌঁছেও দীনেশ কী করে আত্মসংযম করল সেটা একটা দুর্বোধ্য রহস্য। শুধু আরো দ্রুত হয়ে উঠল তার নিঃশ্বাস, হাতের আঙুলগুলো অল্প অল্প কাঁপতে লাগল।

মুখ ভেংচে দীনেশ বললে, বেরিয়েছে বই কি। নবেল-লিখিয়ে বৌয়ের হাতে স্বামীর নিন্দে ছাপা হয়েছে আর তার পুরস্কার মিলবে একশো টাকা। বাড়ীতে মাছ-মাংসের মচ্ছব লাগিয়ে দাও এবার।

গার্গী পত্রিকাটা কুড়িয়ে নিতে যাচ্ছিল, কিন্তু যেন সাপের ছোবল খেয়ে আতঙ্কে হাত গুটিয়ে নিলে।

মনের অসহ্য জ্বালাটাকে সংযত করবার জন্যে দরজার একটা পাল্লা দীনেশ আঁকড়ে ধরল: আমি জানতাম, শেষ পর্যন্ত এমনি কুচ্ছো-কেলেঙ্কারীই চারদিকে ছড়িয়ে পড়বে—শত্রু হাসবে! কাশীর মেয়ে—পণ্ডিত বৌ! 'কেশেলের' পড়ুয়া মেয়ে কোনোদিন ভাল হয় না এ আমার জানাই ছিল!

অপমানে গার্গীর মুখ কালো হয়ে গেল। 'কেশেল' কথাটা আপত্তিকর, কোনো ভদ্রলোক সম্বন্ধে ও-বিশেষণ কেউ সহজে দেয় না।

—আমাকে যা খুশি বলতে পারো, কিন্তু বাবাকে গাল-মন্দ দিয়ো না। তিনি তোমারও গুরুজন।

—গুরুজন!—মুখের চেহারাটাকে কদর্যতর করে আরো কিছু বলতে চাইছিল দীনেশ, কিন্তু সামলে নিলে। বললে, সেই গুরুজনের কাছেই তোমায় পৌছে দিয়ে আসব। সেইখানেই তোমায় মানাবে। আমার মতো চাষা-ভূষোর ঘরে অমন পণ্ডিত-বৌ শোভা পায় না!

সভয়ে গার্গী বললে, মানে?

—মানে?—দীনেশ বললে, সহ্য আমি অনেক করেছি কিন্তু তারও একটা সীমা আছে। আজই বিকেলের গাড়ীতে তুমি কাশী যাবে। সেখানে গিয়ে টোল খোলো, ছত্রের তলায় বসে কথকতা করো, মা-গোঁসাই হয়ে শাস্তর আওড়াও আর গাদা গাদা নাটক নবেল লেখো—কিছুই আমার বলবার নেই। কিন্তু এ-বাড়িতে বসে এসব তোমার চলবে না।

গার্গীর ঠোঁটদুটো একসঙ্গে জুড়ে এল।

—তুমি আমায় তাড়িয়ে দিতে চাও?

দীনেশ বিকৃতমুখে জ্বালাভরা হাসি হাসল: তাড়িয়ে দেব? তোমার মতো বিদুষীকে তাড়াতে পারি এমন বুকের পাটা আছে নাকি আমার? বলছিলাম, কাশীর পণ্ডিত ঘরে পোষবার মতো সামর্থ্য আমার নেই। অত বড় বিদ্যের জাহাজ আমি সইতে পারব না—আমার সর্বস্ব ভরাডুবি হয়ে যাবে।

সারা শরীর শক্ত করে গার্গী দীনেশের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। তাকিয়ে রইল স্থির কঠিন দৃষ্টিতে। বলতে ইচ্ছে করল, তাই ভালো—তাই ভালো। তোমাদের এই অন্ধকূপে, এই দৈন্য আর হীনতার ভেতরে একটি দিনও আমি আর থাকতে পারছি না। এখানে আমার শরীরের রক্ত তিল তিল করে শুকিয়ে আসছে, আমার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। তাই ভালো। তোমাদের হাত থেকে আমায় নিস্তার দাও। মুক্তির নিঃশ্বাস ফেলে আমি বাঁচি। আমাকে ফিরে যেতে দাও সেই আনীল-প্রশান্ত আকাশের তলায়,

সেই তুলসীঘাটের ছায়াভরা নির্জনতায়, বিশ্বনাথ-কেদারের মন্দিরের সেই শঙ্খ-ঘণ্টা ধূপের ধোঁয়ার গম্ভীর পবিত্রতার মধ্যে!

—পণ্ডিত বৌ! বিদ্যের জাহাজ!—হিংস্র ক্রোধে নিজের কথারই পুনরাবৃত্তি করলে দীনেশ, পত্রিকাটা তুলে নিয়ে ছিঁড়তে লাগল টুকরো করে। গার্গীকে অমনি করে ছেঁড়া যায় না বলেই সমস্ত উত্তেজনাটাকে এইভাবে উদ্গীরণ করে ফেলতে চাইল।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল গার্গী। হ্যাঁ—সেও চলেই যেতে চায়। ফিরে যেতে চায় চন্দ্রশেখর সান্যালের কুমারী কন্যারূপে, ফিরে যেতে চায় যথাস্থানে। এ বাড়িতে তারও জায়গা নেই। এখানে সে অবাঞ্ছিত—সে অনাহূত।

কিন্তু!

কিন্তু কালই বাবার চিঠি এসেছে। হৃদয়ের সমস্ত স্নেহ, সমস্ত মঙ্গলকামনা উজাড় করে দিয়ে বাবা চিঠি লিখেছেন। লিখেছেন, স্বামীর ঘর—সেই তোমার পরম তীর্থ, মা। সুখে দুঃখে, আনন্দে-কল্যাণে—সেখানেই তোমাকে মানিয়ে নিতে হবে। বিয়ের মন্ত্র তো তুমি শুনেছ মা—'যদিদং হৃদয়ং তব, তদিদং হৃদয়ং মম।' হৃদয় তোমাদের অভিন্ন হোক, পতির পন্থানুসরণ তোমার পুণ্যব্রত হোক, স্বামীর সংসার তোমার বৈকুণ্ঠ হোক—

বৈকুণ্ঠ হোক। গার্গী তাকিয়ে দেখল। দীনেশ তেমনি নির্মম হাতে পত্রিকাটা ছিঁড়ে চলেছে। বৈকুণ্ঠই বটে! আর এই সেই বৈকুণ্ঠবিহারী নারায়ণের মূর্তি! আপাতত কল্কি-অবতারের মতো করাল রূপ—গার্গীকে খুন করতে পারে যখন-তখন।

দরজার কাছে এসে থতমত খেয়ে দাঁড়িয়ে গেল চাকরটা। তার দিকে ফিরে রুদ্রকণ্ঠে দীনেশ প্রশ্ন করলে, কী চাই তোর?

চাকরটা দু পা পিছিয়ে গেল।

—বৌদিদিমণির খোঁজে লোক এসেছে বাবু—

—বৌদিদিমণির খোঁজে!—দীনেশের সারা শরীরে ঝাঁকুনি লাগল: কে সে লোক? কোত্থেকে এসেছে? কী চায়?

আরো ঘাবড়ে গিয়ে চাকরটা বললে, অত তো জানিনা বাবু। তিনজন ছোকরা বাবু এসেছে! বললে, আমরা 'যুগের আলো'র আফিস থেকে আসছি—গার্গী দেবীর সঙ্গে দেখা করব!

'যুগের আলো'! ছিন্ন পত্রিকাটার শেষ অংশগুলো তাল পাকিয়ে ছুড়ে দিলে দীনেশ। তারপর আততায়ী যেমন তার বধ্যকে খুঁজে পায়, তেমনি তীরবেগে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে যেতে বললে, বৌদিদিমণিকে আর যেতে হবে না—আমিই যাচ্ছি।

দু-হাত বাড়িয়ে দীনেশের পথ রোধ করে দাঁড়াতে চাইল গার্গী, বলতে চাইল: অপরাধ আমার—যা কিছু শাস্তি আমাকেই দাও। কিন্তু বাড়ী বয়ে যাঁরা এসেছেন, তাঁদের অপমান কোরো না—

কিন্তু ক্ষিপ্ত ক্রুদ্ধ দীনেশকে আটকে রাখা ক্ষমতার বাইরে। ততক্ষণে বাড়ি-কাঁপানো চটির শব্দ দ্রুতবেগে নিচের দিকে নেমে চলেছে। নিরুপায় গার্গী ছুটে চলে গেল পশ্চিমের ঘরের জানলাটার কাছে। সেখান থেকে সদর দরজাটা স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যায়।

গার্গী সেখানে পৌঁছুবার আগেই দীনেশের আগুন ঝরা চিৎকার শোনা গেল: গার্গী দেবী? না, গার্গী দেবী বলে কেউ এখানে থাকে না!

বাসন্তী রঙের চাদর পরা চশমা চোখে একটি যুবক সবিস্ময়ে পকেট থেকে একখানা খাম বের করলে: কিন্তু এখানে যে স্পষ্ট ঠিকানা দেওয়া রয়েছে—

—ভুল—ভুল ঠিকানা!—দীনেশ আবার চিৎকার করে উঠল: বলছি ও নামে কেউ এখানে থাকে না—তবু বিরক্ত করছেন কেন?

চাদরপরা ছেলেটি আবার বললে, অত ক্ষেপছেন কেন আপনি? দেখুন না, শুধু বাড়ির নম্বর নয়—নামও দেওয়া রয়েছে—'মৈত্রেয় নিবাস'। এ-বাড়ির নামও তো তাই দেখছি। আপনি একবার ভালো করে খোঁজ করে দেখুন—আমাদের বিশেষ দরকার। বোধ হয় তাঁরা অন্ত ভাড়াটে হবেন। আমরা গার্গী দেবীকে পুরস্কারের একশো টাকা আর অভিনন্দন—

কিন্তু দীনেশ কথাটাকে শেষ করতে দিলে না। তিক্ত কণ্ঠে আবার সে

চিৎকার করে উঠল : অন্য ভাড়াটে! এ বাড়ির মালিক আমি—এখানে কোনো ভাড়াটে নেই। বলছি চলে যান এখান থেকে—বিরক্ত করবেন না—চলে যান—

পেছন থেকে ষণ্ডা গোছের একটি ছেলে এগিয়ে এল।

—অত মেজাজ দেখাচ্ছেন কেন? কথা বলতে পারেন না ভদ্রলোকের মতো?

—ভদ্রলোক! ক'টা ভদ্রলোক দেখেছ তুমি?—দীনেশের গলা চিরে একটা পৈশাচিক স্বর বেরুল : চলে যাও বলছি। নইলে পুলিশ ডাকব—

—ডাকুন পুলিশ—ছেলেটি আস্তিন গোটালো।

—যেতে দাও, যেতে দাও হে নৃপেন—চশমাপরা ছেলেটি নৃপেনের হাত ধরে টানল : কী হবে মিছে গণ্ডগোল করে? ভদ্রলোক যখন বলছেন এ বাড়িতে ও নামে কেউ নেই, তখন ওঁকে তো আর অবিশ্বাস করা যায় না!

—কিন্তু সেটা বলবারও তো একটা রীতি আছে। যেন তেড়ে মারতে আসছেন!

—চলো, চলো, চলে এসো। অফিসে গিয়ে আবার মিলিয়ে দেখতে হবে ঠিকানাটা—দলটা আস্তে আস্তে রাস্তার দিকে সরে গেল।

অগ্নিবর্ষী চোখে দীনেশ দাঁড়িয়ে রইল সেখানে। গার্গী আবার নিজের ঘরে পালিয়ে এল। ড্রেসিং টেবিলটা আঁকড়ে ধরে দাঁড়িয়ে থেকে ভাবতে লাগল : এর পরে কী করবে দীনেশ? বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেবে তাকে? হাত তুলবে তার গায়ে?

কিন্তু!

বাবার চিঠিখানা চোখের সামনে ভাসতে লাগল তার। 'যদিদং হৃদয়ং তব।' হৃদয় তোমাদের অভিন্ন হোক—স্বামীর সংসার তোমার বৈকুণ্ঠ হোক—

আজ যদি সে বাবার কাছে ফিরে যায়? ফিরে যায় স্বামীর সংসারের সঙ্গে সমস্ত সম্বন্ধ নিঃশেষে চুকিয়ে দিয়ে? সে হয়তো মুক্তি পাবে—সে হয়তো নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচবে—কিন্তু বাবা?

দিনের পর দিন সে কি তাঁর বুকের ভেতর কাঁটার মতো বিঁধে থাকবে না? স্বামী-পরিত্যক্তা একমাত্র সন্তানের দিকে তাকিয়ে তাঁর মুখের প্রতিটি গ্রাস বিস্বাদ হয়ে যাবে প্রতি মুহূর্তে, তাঁর মন জ্বলে যেতে থাকবে অসহ্য বিষাক্ত যন্ত্রণায়। যার ক্ষুব্ধ অভিসম্পাতে সমস্ত বাড়ির আবহাওয়া আবিল হয়ে যাবে।

তা ছাড়া—

তা ছাড়া প্রতিবেশীদের তো একেবারে অচেনা নেই তার। এই নিয়ে সারাক্ষণ অলস কল্পনার জাল বুনবে তারা, নিন্দা আর কুৎসার পঙ্কিল আবর্ত রচনা করে যাবে। রচনা করবে বীভৎসতম কাহিনী—একজন আর একজনের কানের কাছে মুখ এনে অন্তরঙ্গ গলায় বলবে, সোয়ামী কি সাধে ত্যাগ করেছে বাপু? নিশ্চয় কিছু একটা বাধিয়েছিল, স্বভাব-চরিত্তিরেরও কিছু—

সীমাহীন আতঙ্কে গার্গী কাঠ হয়ে গেল। অম্লানগৌরব চন্দ্রশেখর সান্ন্যালের নামের সঙ্গে জড়িয়ে যাবে অর্থহীন কলঙ্ক—তাঁর শুভ্র পবিত্রতার ওপর একরাশ কালি ছিটিয়ে দেবে তারা। ঘরে-বাইরে বাবা কারুর সঙ্গে চোখ তুলে কথা কইতে পারবেন না—গা'র ঘাটে যাওয়া, মন্দিরে যাওয়া বন্ধ হয়ে যাবে!

শুধু তারই জন্যে! অসীম স্নেহ দিয়ে বাবা তাকে গড়ে তুলেছেন—শিক্ষায়-দীক্ষায় আলো করে তুলতে চেয়েছেন তার মন। একি তারই প্রতিদান?

তা ছাড়া দীনেশকেই কি বিশ্বাস আছে? বাবার কাটা ঘায়ে নির্মমভাবে সে নুনের ছিটে দিতে থাকবে, প্রতিবেশীদের কুৎসিত কল্পনায় উপকরণ জুগিয়ে চলবে প্রত্যেক দিন—নানাভাবে, নানা উপায়ে। অমার্জিত রুক্ষ দীনেশের প্রতিহিংসা যে কতদূর পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছুবে, জোর করে কে তার আন্দাজ দিতে পারে?

তার চেয়ে এই ভালো। নিজের সমাধি নিজের হাতেই রচনা করুক গার্গী। এই বাড়ীতে—এই মৃত্যুম্লান অন্ধকারে দিনের পর দিন সে হারিয়ে

যাক—এখানকার জমাট কালো ছায়ার মধ্যে মুছে যাক সে। দীনেশ খুশি হোক, বাবা নিশ্চিন্ত থাকুন, মা-র একটি দিনের ঘুমেও যেন ব্যাঘাত না ঘটে!

দীনেশের ইচ্ছার বিরুদ্ধে আর সে এক চুলও নড়বে না। ওই ঘড়িটার শব্দের সঙ্গে সঙ্গে একটা প্রাণহীন নিয়ন্ত্রিত মৃত্যুর মধ্যে সে নিশ্চিন্ত হোক। প্রতি মুহূর্তে সে মনে রাখবে এই তার বৈকুণ্ঠ—তার স্বামীর পশ্চানুসরণ ছাড়া আর কোনো কাজই করবার নেই!

'ব্রতে তে হৃদয়ঞ্চ মনঞ্চ দধাতু—'

বিয়ের মন্ত্র। পতির ব্রতে সে হৃদয় আর মন দান করবে। দূরে থাকুক আকাশ—দূরে থাকুক সমুদ্র, দূরে থাকুক জীবন আর শিল্প। কুমারী গার্গী মরে গিয়ে আজ বস্তুতান্ত্রিক ব্যবসায়ী দীনেশ মৈত্রের উপযুক্ত জীবন-সঙ্গিনী নবজন্ম গ্রহণ করুক।

দীনেশ ঘরে ঢুকল।

—চরম হয়েছে, আর নয়। বাইরে থেকে গুণ্ডা-বদমায়েসের দল মৈত্র বাড়িতে চড়াও হ'তে আরম্ভ করেছে!—বিচিত্র শান্ত গলায় দীনেশ বললে, এইবার তোমার জিনিসপত্র সব গুছিয়ে নাও।

কিছুক্ষণের জন্যে গার্গী স্থির হয়ে রইল। আত্মহত্যা করতে গিয়ে চলন্ত এঞ্জিনের সামনে ঝাঁপিয়ে পড়ার পূর্ব মুহূর্তের দ্বিধাটুকু যেন তাকে আঁকড়ে রাখল।

পরক্ষণেই দীনেশের পায়ের কাছে ভেঙে পড়ল গার্গী: ক্ষমা করো আমাকে!

দীনেশ চমক খেল! সন্দেহে ছলকে উঠল চোখ। এতখানি সে-ও আশা করে নি।

গার্গী আবার বললে, তোমার পা ছুঁয়ে বলছি, আর কোনোদিন একটা লাইনও আমি লিখব না। তুমি আমাকে যা হতে বলো—আমি তাই হবো, অক্ষরে অক্ষরে পালন করব তোমার হুকুম।

সুন্দর মুখের ওপর দিয়ে চোখের জল গড়িয়ে পড়ছে, তাকিয়ে দেখল

দীনেশ। ভাবল, এ তার জয়ের গৌরব! এমন কি, খানিকটা সহানুভূতিতেও সে চঞ্চল হয়ে উঠল, আর মনে হল, এমন সুন্দরী স্ত্রীর এত বড় অপরাধটাও একেবারে ক্ষমার অযোগ্য নয়!

কিন্তু এত সহজেই নিজের দুর্বলতা প্রকাশ করা যায় না! হুঁশিয়ার, ব্যবসায়ী লোক দীনেশ। তা ছাড়া মেয়েদের বেশি প্রশ্রয় দিতে নেই—দীনেশ জানে। একটু ঢিলে দিলেই মাথায় চড়ে বসতে চায় ওরা।

গম্ভীর গলায়, বিচারকের ভঙ্গিতে দীনেশ বললে, ঠিক বলছ?

একবার ঠোঁট কামড়ে ধরল গার্গী। তারপর আঁচল দিয়ে চোখ মুছে ফেলে বললে, মিথ্যে কথা বলতে বাবা আমায় শেখান নি।

দীনেশ সন্দেহে ভ্রূকুঞ্চিত করল একবার। কিন্তু সামনে গার্গীর চোখ দুটি জলে টলমল করছে তখনো। এমন সুন্দর অশ্রু-কোমল মুখ সে কোনোদিন দেখেনি। হাঁ—বিজয়ী দীনেশ মনের দিক থেকে এখন অনেকখানি উদার হয়ে গেছে, গার্গীর অনেকখানি অপরাধ এখন সে ক্ষমা করতে পারে।

—বেশ, এবারে আমি ক্ষমা করলাম। কিন্তু ভবিষ্যতে যদি কখনো আবার কিছু দেখি—চোয়ালের হাড়দুটোকে শক্ত করে দীনেশ বললে, তা হলে সেদিন—যাক সে কথা। আর কী কী লিখেছ, সব বের করো।

গার্গী নিরুত্তরে আলমারীর ড্রয়ারের দিকে এগিয়ে গেল। বের করে আনলে কিছু কাগজপত্র, খান কয়েক মাসিক পত্রিকা, তার বুভুক্ষার কৃপণ সঞ্চয়।

দীনেশ বললে, হুঁ এইসব বাজে জিনিস পড়েই বাড়ির বৌ ঝি নষ্ট হয়, আর পাশের বাড়ির ছোকরাদের উড়ো চিঠি লেখে—

গার্গীর চোখ দপ্ করে উঠেই নিবে গেল। না—আর সে প্রতিবাদ করবে না। নিজের ভাগ্য সে বেছে নিয়েছে।

আরো আধঘণ্টা পরে অন্নপূর্ণা যখন বেড়িয়ে ফিরলেন, তখন উঠোনে এক বিরাট অগ্নিকুণ্ড জেলে এক মনে কাগজ পোড়াচ্ছে দীনেশ। আর দূরে একটা থাম ধরে আকাশের দিকে নির্বাক হয়ে তাকিয়ে আছে গার্গী।

সবিস্ময়ে অন্নপূর্ণা বললেন, খোকা—এ কী?

দীনেশ বিরক্তস্বরে বললে, সব জিনিস শুনে তোমার কী হবে মা? নিজের কাজে যাও।

বিহ্বল অন্নপূর্ণা অচেতনভাবে কী একটা অনুমান করে গার্গীর দিকে দৃষ্টি ফেরালেন। তেমনি স্তব্ধ হয়ে গার্গী থাম ধরে দাঁড়িয়ে আছে মূর্তির মতো। এলোমেলো হাওয়ায় হঠাৎ খানিকটা কালো ছাই উড়ে গিয়ে তার মুখের ওপরে ছড়িয়ে পড়লো।

আট

চন্দ্রশেখর চেয়েছিলেন, এই সময়টা গার্গী তাঁর কাছে এসেই থাকুক। সবিনয়ে একখানা দীর্ঘ চিঠিও গায়ত্রী লিখেছিলেন অন্নপূর্ণার কাছে। মা অন্নপূর্ণার মন দুলে উঠেছিল, বিশেষ কোনো আপত্তিও তাঁর ছিল না। কিন্তু দীনেশই প্রতিবাদ করে বসল: না, না, ওসব কিছু করবার দরকার নেই।

অন্নপূর্ণা ক্ষীণভাবে বললেন, তবু মায়ের মন—

রূঢ় দৃষ্টিতে দীনেশ তাকালো। ফতুয়ার পকেটে চাবির তোড়াটা একবার বাজিয়ে নিয়ে অকুণ্ঠ স্পষ্ট গলায় বললে, মায়ের মন! কিন্তু আর একটা দিকও তো আছে। এই প্রথমবার—নানারকম ঝক্কি-ঝামেলা রয়েছে। যদি একটা কোনো গোলমাল হয়, কাশীতে কী এমন ডাক্তার-বদ্যি আছে শুনি? বরং এখানে কোনো কিছু হলে সঙ্গে সঙ্গেই একটা বন্দোবস্ত হবে। সে কথাটা কেন ভেবে দেখছ না?

দীনেশের এই নির্লজ্জ স্পষ্টভাষিতায় কিছুক্ষণ হতভম্ব হয়ে রইলেন অন্নপূর্ণা। নিজের আসন্ন সন্তানকে নিয়ে মার কাছে এমন নগ্ন ভাষায় কেউ কথা বলতে পারে—অন্নপূর্ণা কোনোদিন কল্পনাও করতে পারেন নি। লোহার ব্যবসা করতে গিয়ে দীনেশ কি কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান চিরকালের মতো হারিয়ে বসে

আছে? না হয় লেখাপড়া করেই নি বেশিদিন, কিন্তু কার সঙ্গে যে কী ভাষায় কথা কইতে হয়, সে সহজ বুদ্ধিটুকুও কি লোপ পেয়ে গেছে তার?

—বেশ, তাই হবে—

এর পরে আর কিছু বলবার সাহস হয়নি অন্নপূর্ণার। নির্বোধ নির্লজ্জ দীনেশ আরো কী যে বলে বসবে কে জানে! মনে মনে ছি ছি করে এবং দেড় হাত জিভ কেটে সামনে থেকে পালিয়ে গেলেন তিনি।

দীনেশ পেছন থেকে ডাক দিয়ে বললে, তুমি ওঁদের এসব কথা খোলাখুলি লিখে দাও মা। ওঁরা তো নেহাৎ অবুঝ নন, বুঝবেন নিশ্চয়ই।

বিছানায় ভারাক্রান্ত ক্লান্ত দেহ এলিয়ে দীনেশের কথাগুলো শুনল গার্গী। নিরাশ হল না, ব্যথাও পেল না। ক্রমাগত ব্যথার জায়গায় ঘা দিতে দিতে দীনেশ তার অনুভূতিকে অসাড় করে দিয়েছে। দীনেশের কাছে কোনো কিছু আশা করবার মতো মূঢ়তা তার কেটে গেছে অনেকদিন আগেই।

সে জানে, দীনেশ তাকে যেতে দেবে না। ডাক্তার-কবিরাজের দোহাইটা নিতান্তই গৌণ। হঠাৎ শুনলে মনে হবে, বস্তুতান্ত্রিক দীনেশ নিছক বস্তুতান্ত্রিকের মতোই হিসেব করে রেখেছে জিনিসটা—যা বোঝবার বুঝেছে সহজভাবে। কিন্তু গার্গী জানে, ওই হিসাবের আড়ালে দীনেশের একটা প্রচণ্ড জ্বালা আছে, আছে একটা তীক্ষ্ণ আবেগ; এটুকু তারই ওপরে একটা কৈফিয়তের ছদ্মবেশ পরানো ছাড়া আর কিছু নয়।

না, চন্দ্রশেখর সান্যালকে দীনেশ ক্ষমা করতে পারেনি।

আজো তার বিশ্বাস চন্দ্রশেখর তাকে ঠকিয়েছেন। ঘরের বউ চেয়েছিল দীনেশ, চেয়েছিল একটি আদর্শ সতী-সাবিত্রী। বাইরের লোক ঘোমটার আড়ালে যার মুখ দেখতে পাবে না, দশ হাতে যে ঘর সংসারের সব কিছু গুছিয়ে রাখবে, কড়া নজর রাখবে ঝি চাকরের ওপর আর অবসর সময়ে বাটা বাটা পান সাজবে। কিন্তু তার বদলে তার ঘাড়ে কাশীর পণ্ডিত গছিয়েছেন চন্দ্রশেখর, সুর করে যে সংস্কৃত পড়তে পারে, দরকার হলে পুরুতগিরি করে জুটিয়ে আনতে পারে চাল-কলা।

সে পর্যন্তও দীনেশ সহ্য করতে পারত। এমনকি, মন্মথের ইস্কুলে-পড়া ঘোমটা খোলা বেহায়া বৌয়ের মতো নাটক-নভেল পড়লেও তার একটা সীমা ছিল, কিন্তু এ শুধু নভেলই পড়ে না, আবার নভেল লেখেও! বাড়ির ঘটনা নিয়ে, স্বামীকে নিয়ে, কুৎসা কেলেঙ্কারী করে ছাপার হরফে!

দীনেশ অবশ্য গার্গীকে সেদিন খুন করেনি। কিন্তু খুন না করলেও যে বহ্ন্যুৎসব সে করেছিল, তার আগুন সেখানেই সে থামতে দেয়নি। দিনের পর দিন পুড়িয়েছে গার্গীকে—হাতুড়ির ঘা মেরে মেরে নিজের ইচ্ছেমতো নুইয়ে নিয়েছে। আজ আর অতৃপ্তির কারণ নেই দীনেশের—এই দেড় বছরের মধ্যে গার্গী প্রাণহীন, স্পন্দনহীন ছায়াসঙ্গিনীতে রূপান্তরিত হয়ে গেছে তার।

তবু এখনো ভয় আছে বইকি। ভয় আছে চন্দ্রশেখরের সান্নিধ্যের, ভয় আছে কাশীর বিষাক্ত আবহাওয়ার। দু দিন ওখানে থাকলেই মাথাটা বিগড়ে যেতে কতক্ষণ?

এই দেড় বছরের মধ্যে একবার অবশ্য দীনেশ গার্গীকে কাশীতে নিয়ে গিয়েছিল। নিয়ে গিয়েছিল সাতদিনের জন্যে। কিন্তু এই সাতটি দিন সে স্ত্রীকে চোখে চোখে রেখেছে, মেলে রেখেছে সদা-সতর্ক শ্যেন দৃষ্টি। চেষ্টা করেছে—যাতে গার্গী যতটা কম সময় থাকতে পারে বাপের কাছে। অবশ্য শাশুড়ী-সম্পর্কে খুব বেশি অনুযোগ দীনেশের নেই। কেমন করে কে জানে—সে অনুভব করেছে, গায়ত্রীর সঙ্গে তার মনের প্রচ্ছন্ন একটা সমধর্মিতা আছে কোথাও।

তাই যে কদিন দীনেশ কাশীতে থেকেছে, একেবারে চরকীর মতো ঘুরেছে গার্গীকে নিয়ে। কখনো বিশ্বনাথের মন্দিরে, কখনো সারনাথে, কখনো রামনগরে, কখনো বা ব্যাস-কাশীতে। ঘোমটাটানা মারোয়াড়ী বধূদের দিকে আঙুল বাড়িয়ে বাড়িয়ে বলেছে: দেখেছ, কেমন সভ্য-ভব্য ওরা। ওদের মতো চলাফেরা করতে শেখো—যাতে দশজনে দেখে খুশি হয়!

দশজনের জন্যে নয়—দীনেশের কথা ভেবেই বুকের ওপর দেড়হাত ঘোমটা টেনে রেখেছে গার্গী। আরো বেশি করে ভেবেছে বাবার জন্যে।

একদিনের জন্যেও তাঁকে একটি কথা জানতে দেওয়া যাবে না—বুঝতে দেওয়া যাবে না। সমস্ত অন্তর উজাড় করে আশীর্বাদ দিয়ে তাকে পতিগৃহের বৈকুণ্ঠে পাঠিয়েছেন বাবা, ঘুণাক্ষরেও তাঁকে বলা যাবে না—সে বৈকুণ্ঠে কী ভাবে তার দিন কাটছে।

মুহূর্তে মুহূর্তে চোখে মুখে ফুটিয়ে তুলতে হয়েছে সুখের অভিনয়, জোর করে হাসতে হয়েছে, এমনকি যোগ দিতে হয়েছে সমবয়সের বান্ধবীদের গূঢ়ার্থক নির্লজ্জ রসিকতায়। একটু ছিদ্র পেলেই হয়তো দীনেশ আর রক্ষা রাখবে না, সকলের সামনেই এমনভাবে চীৎকার করে উঠবে যে, মেয়ের সুখ-সম্পর্কে বাবার সমস্ত কল্পনা যাবে ধূলিসাৎ হয়ে! এর চাইতে মর্মান্তিক আঘাত চন্দ্রশেখরের আর নেই : এ আঘাত তিনি সহ্য করতে পারবেন না।

না, কাশীতে গিয়ে তার দরকার নেই। এইখানেই যদি তাকে মরতে হয়, তবে তাই সে মরুক।

দীনেশ নিচে নেমে গেছে। গার্গী তেমনি ভাবেই চোখ বুজে বিছানায় পড়ে রইল। নিজের দেহের মধ্যে সে যে আর একটি বুকের অতি ক্ষীণ স্পন্দন শুনতে পাচ্ছে—তারই সন্তানের প্রাণ-স্পন্দন! আর একটি নতুন মানুষ গার্গীর রক্তবিন্দু থেকে জীবন আহরণ করছে; বেরিয়ে আসতে চাইছে সূর্যের আলোয়—মুক্তি পেতে চাইছে সংসারের মধ্যে।

কিন্তু কোন্ সংসার?

ভাবতে গিয়েও গার্গী শিউরে উঠল একবার। এই আড়ষ্ট ছায়া-ভরা পুরোনো বাড়িটার ভেতরে—যেখানে অদ্ভুত ঘড়িটা বিচিত্র শব্দে প্রহর গোণে? যেখানে ভারী ভারী ফার্ণিচারের চারদিকে কালো কালো কী সব জমাট বেঁধে থাকে, যেখানে দেওয়ালের ভেতরে থেকে গলা টিপে ধরার জন্যে কারা যেন হাত বাড়ায়? এই সংসারে জন্ম নেবে তার সন্তান? আলোহীন চারাগাছের মতো বিবর্ণ হলদে হয়ে আসবে দিনের পর দিন—জীবনের সমস্ত রস পলকে পলকে যাবে শুকিয়ে—যেখানে একরাশ চাবির তাড়ার ঝঙ্কারের মধ্যে চাপা পড়ে যাবে :

"ভাই কি ধাইছে গঙ্গা ছাড়ি হিমগিরি
অরণ্য বহিছে ফুলফল,
শত কোটি রবি তারা আমাদের ঘিরি
গণিতেছে প্রতি দণ্ড-পল ?"

চন্দ্রশেখরের গম্ভীর গভীর গলার আবৃত্তি। গার্গীর হঠাৎ ডাক ছেড়ে কেঁদে উঠতে ইচ্ছে করল। কিন্তু কাঁদতে পারল না গার্গী। বালিশের মধ্যে মুখ গুঁজে একটা মৃদু যন্ত্রণার সঙ্গে সঙ্গে অনুভব করতে লাগল, তার দেহের আড়ালে আর একটি প্রাণের আত্মপ্রকাশের আর্তি, তার রক্তের তালে তাল মিশিয়ে আর একটি তরুণ রক্তনাড়ীর ক্ষীণতম স্পন্দন।

* * *

কাশীর বিশ্বনাথ আর কালীঘাটের কালীর কাছে মানত করা ব্যর্থ হয়নি অন্নপূর্ণার। শেষ পর্যন্ত ছেলেই হল দীনেশের। টুকটুকে ফুটফুটে ছেলে।

বাড়িতে মিঠাই বিতরণের যজ্ঞ করে বসলেন অন্নপূর্ণা। সন্দেশের থালা গেল দূর-নিকট আত্মীয়দের বাড়িতে বাড়িতে। পেট পুরে খেয়ে একটা তৃপ্তির ঢেকুর তুলে মন্মথ বললে, ছেলেটা ভাগ্যবান হবে দীনেশ।

প্রসন্নদৃষ্টিতে দীনেশ বন্ধুর দিকে তাকালো।

মন্মথ বললে, চেহারা তোমার মতো হয়নি—হয়েছে ওর মার মতো। শাস্ত্রে বলে, মার মতো ছেলে জীবনে সুখী হয়।

—তাই নাকি ?—কথাটা জানা সত্ত্বেও অকৃত্রিম খুশিতে দীনেশ অজ্ঞতার ভান করলো।

—ওসব শাস্ত্র-টাস্ত্র আমি বিশেষ মানি না—অভ্যস্ত ভঙ্গিতে ঠোঁট কুঁচকে মন্মথ একটা সিগারেট ধরালো : কিন্তু মার মতো চেহারা যখন হয়েছে, তখন খানিকটা বুদ্ধি-শুদ্ধি হবেই। তোমার মতো রক্তহীন লোহার পিণ্ড হয়েই যাবে না—পৃথিবীটাকে চোখ মেলে দেখতে শিখবে অন্তত।

খোঁচা লাগল দীনেশের, জুড়ে আসতে চাইলে ভ্রূদুটো। কিন্তু প্রসন্নতার পরিমাণটা আজ এতই বেশি যে, মন্মথর আঘাতটায় তেমন করে জ্বালা ধরল

না গায়ে। মুখে একটুখানি হাসির রেখাই বরং টেনে আনল দীনেশ : আচ্ছা, দেখা যাবে সেটা।

—মানে, মতলব কী তোমার?—মন্মথ আবার ঠোঁট বাঁকালো : ছেলেটাকেও তোমার মতো কড়ি-বরগা, চেন-বল্টু করতে চাও নাকি? দোহাই বাপু, নিজে তো লক্ষ্মীপ্যাঁচা হয়ে কোটরে বসে আছো—এ বেচারাকে একটু আলো-হাওয়ায় ডানা মেলতে দিয়ো।

—পাখ্‌না গজাবার সুযোগ দিতে বলছো?—বুদ্ধিমানের মতো একটা প্রত্যুত্তর দিতে চাইল দীনেশ।

মন্মথ বললে, তা দিলেই বা ক্ষতি কী! তুমি তো যখের মতো জমিয়েই চলেছ, ছেলেটা যদি তার কিছু ওড়াবার সুযোগ নাই-ই পায় তবে আর তোমার ঘরে জন্মালো কেন?

দীনেশ বললে, হুঁ।

কিন্তু পরের কথা পরে। দীনেশ জানে, শক্ত হাতে সংসারের রাশ ধরা আছে তার, যেভাবে সে গার্গীর মতো বুনো ঘোড়াকে বশ মানিয়েছে—যেভাবে এতবড় কারবারের হাল ধ'রে বসে আছে বর্ষার গঙ্গায় নির্ভুল মাঝির মতো, সেইভাবে ভবিষ্যৎকেও সে চালিয়ে নিয়ে যাবে। দীনেশের ছেলে কোনোদিন বাপকে ছাড়িয়ে যাওয়ার স্পর্ধাকে মনের কোণেও ঠাঁই দিতে পারবে না—গোড়াতেই সে দিকে মেলা থাকবে তার সতর্ক তীক্ষ্ণ দৃষ্টি।

আপাতত খুশিটাকে সে বাধা দিলে না। কৃপণ, হিসাবী দীনেশ এক মাসের মাইনে বোনাস্‌ দিলে কর্মচারীদের—ষষ্ঠীর দিনে তিনশো লোক তার বাড়ীতে নিমন্ত্রণ খেল।

চন্দ্রশেখর এলেন প্রায় একমাস পরে।

আগেই আসতেন, কিন্তু মাস তিনেক ধরে বাতের ব্যথায় অত্যন্ত কাবু হয়ে পড়েছিলেন, বিছানা ছেড়ে উঠতে পারেন নি, অথচ নাতির মুখ দেখবার জন্যে

অসহায় ভাবে ছটফট করেছেন। বাতের ব্যথার চাইতেও সেই যন্ত্রণাটাই বড় হয়ে উঠেছিল তাঁর কাছে!

একটু সেরে উঠতেই ছুটে এসেছেন কলকাতায়।

গার্গী ছুটে বেরিয়ে এল বারান্দায়। একটা লাঠিতে ভর করে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠছেন বাবা। মুখের ক্লান্তি আর শারীরিক যন্ত্রণার উপরে আনন্দ আর উৎকণ্ঠার আলো ঝলমল করছে।

আজ দীনেশকে দেখেও নিজেকে সংযত করল না গার্গী, স্বামীর পাখি-পড়ানো ভালো ভালো উপদেশগুলিকে মনে রাখতে পারল না। ছুটে গিয়ে পড়ল চন্দ্রশেখরের বুকের ওপর—ঝর ঝর করে জল পড়তে লাগল দু' চোখ বেয়ে।

শান্ত-সংযত চন্দ্রশেখরও চোখের জল রাখতে পারলেন না। গার্গীর কাঁধে হাত রেখে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন, টপটপ করে দু ফোঁটা জল পড়ল গার্গীর চুলের ওপর।

কয়েক মিনিট স্তব্ধতায় কাটল—এমন কি, দীনেশও তাতে বাধা দিল না। একটু সরে গিয়ে বারান্দার রেলিং ধরে নীরব সাক্ষীর মতো দাঁড়িয়ে রইলো সে।

ঘরে থেকে বেরিয়ে এলেন অন্নপূর্ণা। উচ্ছল স্বরে বললেন, বাঃ বেয়াই; এ তো মন্দ নয়। এসেই নিজের মেয়েকে আদর করা হচ্ছে—আমাদের বাড়ির টুকটুকে নতুন খোকা বুঝি ফেল্‌না হল?

—রাজপুত্র কখনো ফেল্‌না হয় বেয়ান? আমি গরীবের মেয়েকে আদর করছি একটু—রোদে-শিশিরে মেশানো স্নিগ্ধ-করুণ হাসি হাসলেন চন্দ্রশেখর।

বাপের বুক থেকে সরে গিয়ে পাশের ঘরে পালালো গার্গী, দীনেশ সেইখানেই রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে রইল। চন্দ্রশেখর অন্নপূর্ণাকে অনুসরণ করলেন।

দুধের মতো শাদা বিছানায় লাল রঙের জামা গায়ে মোমের পুতুলের মতো ঘুমিয়ে আছে খোকা। পাখার হাওয়ায় সোনালী ছোট ছোট চুলগুলি আগুনের শিখার মতো কাঁপছে।

চন্দ্রশেখর মূর্তির মতো কিছুক্ষণ নীরব হয়ে চেয়ে রইলেন সেদিকে। আস্তে আস্তে আশ্চর্য কোমল হয়ে আসতে লাগল তাঁর মুখের রেখাগুলো, একটা আত্ম-সমাহিতির নিঃশব্দ সঞ্চারে কেমন স্তিমিত হয়ে এল তাঁর চোখের দৃষ্টি।

তারপর একটু একটু করে নড়তে লাগল তাঁর ঠোঁট। প্রার্থনা উচ্চারণ করবার মতো মৃদু-গভীর স্বরে চন্দ্রশেখর বললেন, কল্যাণ হোক। আত্মাকে জানুক, সত্যকে জানুক—শৌর্য আর প্রেম দিয়ে জীবনকে জয় করুক।

—নয়—

সেই যে অন্তরের সমস্ত শুভ-কামনা উজাড় করে চন্দ্রশেখর নবজাতককে আশীর্বাদ করে গেলেন, তারপরে তাঁর সঙ্গে আর গার্গীর দেখা হয়নি। ছ-মাস পরে টেলিগ্রাম পেয়ে দীনেশ যখন গার্গীকে নিয়ে কাশীতে গিয়ে পৌছুল তখন গঙ্গার নীলাঞ্চল জলে গাঙ্গেয় সমতটের গৈরিক আবিলতা নেমেছে। মণি-কণিকার সিঁড়ি ছাপিয়ে জল অনেকখানি ওপরে উঠে এসেছে, সংখ্যাতীত চিতার অঙ্গারশয্যা মুছে গেছে খর-তরঙ্গের আঘাতে আঘাতে। চন্দ্রশেখরের চিতা প্রায় নিভে এসেছে তখন, আগুনের শিখাগুলো অল্প অল্প কাঁপছে চঞ্চল জলের ওপর।

'ওঁ মধুবাতা ঋতায়তে মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ—'

নিঃশব্দ ম্লানমুখে চন্দ্রশেখরের ছাত্রেরা—অন্যান্য আত্মীয়-স্বজন, এদিকে-ওদিকে ছড়িয়ে বসে আছে সব। আর সকলের কাছ থেকে দূরে সরে একা বসে আছেন গায়ত্রী—পাথরের দেওয়ালে পিঠ দিয়ে স্থির দৃষ্টিতে গঙ্গার জলের দিকে তাকিয়ে আছেন—কি দেখছেন তিনিই জানেন। আচ্ছন্ন-বিবশ চেতনা সত্ত্বেও গার্গীর হঠাৎ মনে হল, মা-র আঁচলে অত রক্ত কেন?

কিন্তু রক্ত নয়! দীর্ঘদিন ধরে ললাটে-সীমন্তে যে সিঁদুরের রেখা গায়ত্রী এঁকে এসেছেন, বয়ে এসেছেন সৌভাগ্যের যে জয়পত্র, তাকে নিঃশেষে মুছে

ফেলার কাজটা সহজ হয় নি। সমস্ত আঁচলটা মাখামাখি হয়ে গেছে, খানিকটা ছড়েও গেছে কপাল, তবুও শেষ গোধূলির আভাসের মতো খানিকটা রক্তিমা জড়িয়ে আছে সেখানে। পাশেই নুড়ির ওপর অম্লান শুভ্র দু-গাছা ভাঙা শাঁখা—সূর্যের আলোয় একরাশ নিষ্ঠুর শীতল হাসির মতো তারা ঝকঝক করে উঠল।

যেন অসহ্য একটা শীতে গার্গী একবার থরথর করে কেঁপে উঠল—দাঁতে দাঁতে ঠক ঠক করে বাজল তার। পরক্ষণেই চেতনা হারিয়ে লুটিয়ে পড়ে গেল মা-র পায়ের কাছে।

শ্রাদ্ধ-শান্তি চুকিয়ে যেদিন গার্গীর কলকাতায় ফেরবার কথা, তার আগের রাত্রে গায়ত্রী কাছে ডাকলেন মেয়েকে।

চন্দ্রশেখরের পুজোর ঘরে একখানা কুশাসনে রুক্ষ চুল মেলে দিয়ে শুভ্রবাসা গায়ত্রী বসেছিলেন। গার্গী মায়ের পাশে এসে বসল।

—শুভ ঘুমিয়েছে?—শুভ, শুভেন্দু, গার্গীর ছেলে।

গার্গী মাথা নেড়ে জানালো: ঘুমিয়েছে।

গায়ত্রী দীর্ঘশ্বাস ফেললেন: আজ সারাদিন কেঁদে কেঁদে উঠছে। শরীরটা বোধ হয় ভালো নেই ওর।

মেয়ের জবাব এল না। গায়ত্রী আবার নিজের মনেই বলে চললেন, ওর শরীরের আর দোষ কী। কয়েকদিন বাড়িতে যে ভাবে গেছে। ছেলেটা কী খেয়েছে, কোথায় ঘুমিয়েছে—কেউ লক্ষ্যও করেনি ওর দিকে। কাল আবার সারা রাত গাড়ি করে কলকাতায় যাবে—ভাবতেও আমার খারাপ লাগছে।

গার্গী ক্লান্ত স্বরে বললে, ও কিছু হবে না—ছেলে-পুলের অমন হয়।

—না, না—ও কোনো কাজের কথা নয়।—গায়ত্রী সন্ত্রস্ত ভাবে বললেন, হেলাছেদ্দা করলে ছেলেটা অসুখে পড়বে। তেমন বেশি দেখলে কাল তোদের যেতেই দেব না।

গার্গী জবাব দিলে না। শুভর কোনো অসুখ-বিসুখ করবে মা হয়ে সে কথা সে ভাবতে চায় না; কিন্তু সত্যিই যদি কিছু হয়—যদি তেমন তেমন বাড়াবাড়ি ঘটেও, তবু দীনেশকে যে কাল রোখা যাবে না—একথা বলা চলে না মা-কে, বলা চলে না গায়ত্রী হাজার চোখের জল ফেললেও বারণ মানবে না দীনেশ। কী করা উচিত, আর কী করা উচিত নয়—দীনেশের মনের মধ্যে তার একটা মাপকাঠি আছে এবং দীনেশের মতে সেটা নির্ভুল। সেখান থেকে কেউ তাকে টলাতে পারে নি, এমন কি অন্নপূর্ণাও না।

তা ছাড়া পনেরো দিন কলকাতার বাইরে আছে দীনেশ—এই তিন বছরের মধ্যে এমন অঘটন আর কখনো ঘটতে দেখেনি গার্গী। তার লোহার কারবার এখন তার নাড়ী ধরে টান দিচ্ছে, তার মুখে গার্গী দেখেছে স্পষ্ট অস্বস্তির ছাপ, অনুভব করেছে তার মনের ছট্‌ফটানি। না, আর ঠেকানো যাবে না দীনেশকে।

গায়ত্রী এবার প্রসঙ্গ বদলালেন।

—ভাবছি, কিছুদিন শাহারানপুরে গিয়ে থাকব।

—শাহারানপুর! অত দূরে?—গার্গী চমকে উঠল।

—হ্যাঁ, দাদার কাছে গিয়েই দিন কয়েক থাকি। দাদাও সেই কথাই বলছেন।

—কিন্তু মা—গার্গী প্রায় আর্তনাদ করে উঠল: বাবার এই বাড়ি, এই ঘর—কথাটা সে শেষ করতে পারল না। চাপতে যাওয়া কান্নার একটা উদগ্র উচ্ছ্বাসে বোবা হয়ে আসতে চাইল গার্গীর স্বর।

গায়ত্রীর দৃষ্টিটা চোখ থেকে নয়—যেন ভেসে এল একটা গভীর সমুদ্রের অতল থেকে। তাঁর গলায় আওয়াজ এল যেন দূর-দূরান্তর পেরিয়ে।

—কিন্তু যে বাড়িতে তিনিই নেই, সেখানে কী করে থাকব বলতে পারিস? চাপা কান্নাটা এবারে আর বাধা মানল না। উচ্ছ্বসিত আবেগে গার্গী ভেঙে পড়ল।

তেমনি অতলান্ত দৃষ্টি মেলে মেয়ের শোকোচ্ছ্বাসের দিকে গায়ত্রী তাকিয়ে

রইলেন কিছুক্ষণ। একটি একটি করে পার হতে লাগল বেদনা-মন্থর রাত্রির মুহূর্তগুলো। কানে আসতে লাগল কেদারেশ্বরের মন্দির থেকে শয়ন-আরতির ঘণ্টার শব্দ।

খানিকটা সহজ হয়ে এসে চোখের জল মুছল গার্গী। ধরা গলায় বললে, আর এ বাড়ির কী হবে?

—তালাবন্ধ থাক এখন।—গায়ত্রী একটা নিঃশ্বাস ফেললেন: দাদা অবশ্য বলছিলেন ভাড়া দিতে। কিন্তু প্রাণে ধরে তা আমি পারব না। এখানকার যা যেমন আছে, তেমনি থাকুক। বাইরের কেউ এসে ওঁর চিহ্ন এ বাড়ি থেকে মুছতে চাইবে, এ আমি কিছুতেই সইতে পারব না।

—তবে তাই করো।—গার্গী সংক্ষেপে জবাব দিলে।

আবার নিঃশব্দ ঘরে রাত্রির মুহূর্তগুলো শুকনো পাতার মতো ঝরে পড়তে লাগল। কেদারের মন্দিরে এখনো শয়ন আরতির ঘণ্টা বাজছে··· পুণ্যধাম বারাণসীর শ্মশানে শ্মশানে এখন জেগে উঠছেন কালভৈরব; বরুণা-অসির সীমান্ত রেখায় 'গণ'-দের নিয়ে প্রহরায় দাঁড়িয়েছেন প্রতিহারী বিনায়কেরা, বিষ্ণুর মাণিক্য-কণিকার দীপ্তিতে একটু একটু করে দীপিত হচ্ছে মণিকর্ণিকার মহাশ্মশান। দশাশ্বমেধ ঘাটে অদেহী যজ্ঞনায়ক ঋত্বিকেরা কালান্তব্যাপী অলক্ষ্য হোমশিখায় হবি অর্পণ করছেন, মন্ত্র উঠছে: ওঁ অগ্নিমীড়ে পুরোহিতং, যজ্ঞস্য দেবমৃত্বিজম্, হোতারং রত্নধাতমম্। এখন কবীর-চৌরা থেকে ভক্ত কবীরের ভজনের সঙ্গে রামগীতির দ্বৈত-রাগিণী মিলিয়েছেন সন্ত্ তুলসী, এখন মহারাজা হরিশ্চন্দ্রের দুঃখ মোচন করবার জন্যে একখানা স্বর্ণরেখা মেঘকে আশ্রয় করে দেবলোক থেকে অবতীর্ণ হচ্ছেন রাজর্ষি আর ধর্মরাজ, এখন ভক্ত রাজা দিবোদাসের প্রার্থনা-মন্ত্র ধ্বনিহীন জ্যোতিঃ-ব্যঞ্জনায় শঙ্কর-অন্নপূর্ণার উদ্দেশে উৎসারিত হচ্ছে।

এই কাশী। পাশুপত-শূলে বিধৃত মর্ত্যের অমৃতপুরী—এখানকার আকাশে বাতাসে দৈবী ধূপের গৈবী সৌরভ। জন্ম-জন্মান্তরের সুকৃতি ফলে মানুষ এইখানে শিব-সাযুজ্য লাভ করে। তবুও গায়ত্রী এখান থেকে পালাতে

চাইছেন—এক মুহূর্তের জন্যেও এই দেবভূমিকে আর সহ্য করতে পারছেন না।

—তুমি কবে যাবে শাহারানপুরে ?—গার্গী স্তব্ধতা ভাঙল।

—তোরা চলে গেলেই। এই তিন চার দিনের ভেতরেই।

—ওখানে তোমার কষ্ট হবে।

—কষ্ট আমার আর কোথাও হবে না মা। সমস্ত সুখদুঃখ যাঁর সঙ্গে আমার জড়িয়েছিল, তাঁর চিতার আগুনে সেগুলোকেও আমি বিসর্জন দিয়ে এসেছি। নিজের বলতে এখন আর কিছুই নেই আমার—কোনো দুঃখকষ্টও না।

—তবু অত দূরে—

—একটু দূরই আমার ভালো।

তাই ভালো—গার্গীও ভাবল। চন্দ্রশেখর নেই, অথচ এই বাড়ি আছে, গায়ত্রী আছেন—একথা ভাবাই চলে না। তার চেয়ে অনেক দূরে—চন্দ্রশেখরের একটি সজাগ স্মৃতিও আঘাত করবার জন্যে যেখানে জেগে থাকবে না—সেখানে সরে যাওয়াই সব চেয়ে ভালো।

একটা কথা মনে এসেছিল। একবার বলা যেতে পারতো, তুমি আমার সঙ্গেই চলো মা, আমার কাছেই থাকো। দিনকতক আমি তোমায় সান্ত্বনা দিতে পারব, তুমি আমায় আশ্বাস দিতে পারবে। তুমি তো জানো না কোন্ অন্ধকূপের মধ্যে আমার অসহ্য রাত্রিদিন বুকের ওপর পাথর চাপা হয়ে থাকে—দু-দিনের জন্যে তুমি আমার কাছে এসে থাকলেও আমি খানিকটা মুক্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচব।

কিন্তু সে কথা বলা চলে না—বলা যায় না কোনো মতেই। গার্গীর সংসার নয়—দীনেশের সংসার। কাশীর চন্দ্রলেখা নীল-নির্মল গঙ্গা নয়, শিকলে বাঁধা বন্যার চার পাশ দিয়ে আবর্জনা-কলঙ্কিত বন্দিনী জাহ্নবীর কাতর কান্না আসে অবিশ্রাম।

তাই গার্গী শুধু বললে, দুটো-একটা চিঠিপত্র দেবে তো মা ? একেবারে ভুলে যাবে না ?

গায়ত্রী বিষণ্ণ করুণ হাসি হাসলেন: চিঠি না দিয়ে উপায় কী, মা? তিনদিন দাদাভাইয়ের খবর না পেলে কি আমিই থাকতে পারব রে? আমার আধখানা প্রাণ তো তোর কাছেই রেখে দিলাম।

গার্গী ঘরে এসে দেখল, নীল আলোর ঠাণ্ডা ছায়ায় অঘোরে ঘুমুচ্ছে দীনেশ। গঙ্গার বুক থেকে রাত্রির হাওয়া এসে তার ঘুমকে সুখনিদ্রা করে তুলেছে। দীনেশ অকৃতজ্ঞ নয়, অল্প অল্প নাসা-গর্জনে তার আরামের পরিমাণটা প্রকাশ পাচ্ছে।

কিন্তু আজ আর বিরাগ বোধ করলে না গার্গী। ঘুমের দোষ নেই—এ ক'দিন অক্লান্ত পরিশ্রম করেছে দীনেশ, একেবারে নিঃশ্বাস ফেলারও সময় পায় নি। শ্রাদ্ধের এত হাঙ্গামার দায় দশ হাতে একাই সামলেছ দীনেশ, লোহার কারবারীর হিসেবী মাথা কোনো সময়েই বিন্দুমাত্র বিচলিত হয় নি। ঠিক কথা—দীনেশ না থাকলে, এত সুন্দরভাবে, এমন পরিপাটি করে কেউ এ-সবের বিলি ব্যবস্থা করতে পারত না।

একটা টুলে বসে গার্গী কিছুক্ষণ ঘুমন্ত দীনেশের দিকে চেয়ে রইল। নিপুণ কর্মপটু স্বামীর ক্ষমতা দেখে তারও মনে গর্বের সঞ্চার হচ্ছে নাকি একটু একটু? এখন হঠাৎ মনে হল, দীনেশেরও একটা নিজস্ব সাম্রাজ্য আছে—যেখানে সে সম্রাট—যেখানে সে অদ্বিতীয়। গার্গীর সঙ্গে হয়তো তার সাধর্ম্য ঘটেনি, হয়তো সরু-মোটা তারে তেমন করে সুরও বাজেনি। কিন্তু তাই বলেই কি দীনেশের সঠিক মূল্য সে নির্ণয় করতে পেরেছে? হয়তো সে না হয়ে দীনেশের কোনো সহধর্মিনী তার ঘরে এলে কোথাও একবিন্দু ফাঁকা ঠেকত না—নিঃশব্দে বিনা প্রতিবাদে জোড় মিলে যেতো। গার্গী এতদিন নিজের দুর্ভাগ্যের কথাই শুধু ভেবেছে, কিন্তু দীনেশের স্বপক্ষেও কি কিছু বলবার ছিল না?

তা ছাড়া সে তো আরো দেখেছে! দেখেছে দীনেশের কর্তব্যবোধ। চন্দ্রশেখরের ছেলে নেই—একমাত্র মেয়ের স্বামী দীনেশ। সেদিক থেকে তার পুত্রের অধিকার; আর সে অধিকারের মর্যাদা পূর্ণ ভাবেই রেখেছে দীনেশ,

হিসেবী ব্যবসায়ী মানুষ কোনো দিকে এতটুকু কৃপণতা করেনি—না টাকায়, না শারীরিক পরিশ্রমে।

এমন কি গায়ত্রীও কাল বলেছেন, দীনেশের মতো ভালো ছেলে আর হয় না মা। এই দুঃসময়ে ও যা করলে, আমার নিজের ছেলে থাকলেও ততখানি করতো কিনা সন্দেহ।

শুনে অভ্যাসমতো একটা তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গে গার্গীর ঠোঁটের কোণা বেঁকে এসেছিল, একটা বিস্বাদ মন্তব্য বেরুতে এসে থমকে গিয়েছিল জিভের গোড়ায়। কিন্তু নীল আলোয় ভরা এই ঠাণ্ডা ঘরে, মাঝরাতের এই ঝুরুঝুরু গঙ্গার হাওয়ায়—ওই বিসদৃশ নাকের ডাকটা সত্ত্বেও দীনেশের প্রতি একটা কৃতজ্ঞ করুণা গার্গীর মনে ছোঁয়া বুলোতে লাগল।

হাঁ, নিজের দোষও তার আছে। সে-ও নিজেকে অনেকখানি সংকুচিত করেছে একটা গণ্ডীর ভেতরে—অনেকখানি ঔদ্ধত্য নিয়ে সরে থেকেছে দীনেশের কাছ থেকে। হয়তো তারও আজ প্রায়শ্চিত্ত করবার প্রয়োজন আছে।

গার্গী সবটা আবার নতুন করে—ফিরে ভাবতে চাইল। বলবে নাকি গায়ত্রীকে? গিয়ে অনুরোধ করবে নাকি একবার: শাহারানপুরে গিয়ে আর দরকার নেই মা, দিনকয়েক আমার কাছে এসেই থাকো?

বিছানার মধ্যে ক্ষীণকণ্ঠে শুভ কেঁদে উঠল। ব্যস্ত হয়ে গার্গী উঠে গেল সেদিকে। তোয়ালেটা বদ্‌লে দিলে, একটুখানি পাউডার ছড়িয়ে দিলে বিছানায়, তারপর আবার শুভকে ঘুম পাড়িয়ে যখন সে খাটের কাছ থেকে সরে যাচ্ছিল, ঠিক সেই সময় দীনেশের গলার স্বরে সে চমকে উঠল।

কখন দীনেশের নাকের ডাক থেমেছে সে টের পায় নি। কখন যে বালিশের ওপর কনুই চেপে আধশোয়া ভঙ্গিতে দীনেশ মাথা তুলেছে, সেটাও চোখে পড়েনি তার।

—এখনও শোওনি?—জড়ানো গভীর গলায় দীনেশ জানতে চাইল।

—না, মার সঙ্গে কথা কইছিলাম।

—অন্যায় !—অভিভাবকতার ধরনে দীনেশ বললে, ওঁর এখন শরীর মন খারাপ। এখন বরং একটু তাড়াতাড়ি বিশ্রাম করাই দরকার ওঁর পক্ষে।

গার্গী বললে, মা শাহারানপুরে যেতে চাইছেন—তাই নিয়েই আলোচনা হচ্ছিল।

—শাহারানপুরে ? কেন ?—হঠাৎ কৌতূহলী হয়ে দীনেশ বিছানার ওপরে উঠে বসল।

—সেখানে বড় মামা ওকালতী করেন। তাঁর বাড়িতেই কিছুদিন থাকবেন।

দীনেশ প্রাজ্ঞতার ধরনে মাথা নাড়ল : তা ঠিক। এখন মাস কয়েক বাইরে গিয়ে থাকলেই মনের দিক থেকে উনি আরাম পাবেন। সে কথা আমিও ভাবছি। কিন্তু শাহারানপুরে কেন ? উনি আমাদের সঙ্গে কলকাতায় যাবেন।

—কলকাতায় !—গার্গী চমকে উঠল : তুমি মাকে বলেছ নাকি সে কথা ?

দীনেশ অল্প একটু মুখ মচকালো : বলবার আবার আছে কী ? আমি ঠিক করেছি, কালকের দিনটাও নয় কাশীতে থেকে একেবারে পরশুই মাকে নিয়ে কলকাতায় বেরিয়ে পড়ব !

মেঘ না চাইতেই জল পাওয়ার মতো আনন্দে কৃতজ্ঞতায় গার্গীর বুক ভরে উঠেছিল—ইচ্ছে করছিল এতদিন পরে, এই প্রথম সে স্বেচ্ছায় স্বামীর পায়ের ধূলো মাথায় কুড়িয়ে নেয় ! কিন্তু দীনেশের পরের কথাটায় কোথায় একটু খোঁচা লাগল, সন্দিগ্ধ শঙ্কায় মন যেন দাঁড়াতে চাইল সশস্ত্র হয়ে।

—কিন্তু মার তো একটা মতামত আছে।

—মতামত কিসের আবার ? আমি ওঁকে নিয়ে যাব—আপত্তি করতে যাবেন কেন ? তা ছাড়া আমার বাড়িতে কোনো কষ্টই ওঁর হবে না—দীনেশ একটা হাই তুলল।

—কষ্টের কথা হচ্ছে না—গার্গী হাসতে চেষ্টা করলো : ওঁরও তো একটা স্বাধীন ইচ্ছে থাকতে পারে।

—স্বাধীন ইচ্ছে!—দীনেশ ভ্রূকুটি করে বসল: ওই তো তোমাদের দোষ। মেয়ে মানুষের মুখে ওসব বড় বড় কথা আমি সহ্য করতে পারিনে। ওঁর প্রতি আমার কর্তব্য আছে, সেই জন্যেই আমি ওঁকে নিয়ে যাব। সেটা ভালোও হবে ওঁর পক্ষে—আর একবার হাই তুলে দীনেশ কথাটার পাদপূরণ করলে।

কর্তব্য! মেয়েমানুষের মুখে বড় বড় কথা! আচমকা কোথা থেকে কী হয়ে গেল। গার্গীর পুরোনো ক্ষতটা মুহূর্তের মধ্যে রক্তাক্ত হয়ে উঠল, যে স্নেহ-কোমল দৃষ্টি নিয়ে এতক্ষণ ধরে সে দীনেশকে নতুন করে সৃষ্টি করতে চাইছিল, বসাতে চাইছিল শ্রদ্ধার আসনে—সেই লঘু মেঘটুকু একটা ঝোড়ো হাওয়ায় উড়ে চলে গেল।

তীব্র কণ্ঠে গার্গী বলে উঠল: আমার মা আর আমি এক নই। তোমার কাছে যা ভালো, আমার মার কাছে তা ভালো নাও হতে পারে।

প্রতিবাদটা এমন অভিনব এবং গার্গীর স্বরটা এত বেশি তীক্ষ্ণ যে দীনেশ কিছুক্ষণ যেন ব্যাপারটা বুঝতে পারল না। হঠাৎ তীর-খাওয়া একটা পাখির মতো সে বিমূঢ় হয়ে তাকিয়ে রইলো, তারপর বললে, মানে?

তিন বছরের জ্বালাটাকে এক ঝলক বিদ্যুতে গার্গী প্রকাশ করে ফেলল: আমার ওপর যা খুশি হুকুম তুমি চালাতে পারো, একটা কথাও আমি বলব না। কিন্তু মার ওপরে সে হুকুম তোমার চলবে না, আর তাঁর সম্পর্কে শুকনো একটা কর্তব্য তোমার করবার দরকার আছে বলেও আমি মনে করি না।

এরপর গার্গী যা আশা করেছিল দীনেশ তার কিছুই করলে না। গর্জন করে উঠল না, ছুড়ে ফেলে দিলে না বিছানার চাদর-বালিশ, তার হাতের মুঠি উদ্যত হয়ে উঠল না গার্গীকে আক্রমণ করবার উদ্দেশ্যে।

বিনা দোষে নিষ্ঠুর দণ্ড পাওয়ার মতো বিহ্বল স্বরে দীনেশ বললে, মা-ও কি তাই মনে করেন?

ঝোঁকের মাথায় গার্গী তেমনি নির্মমভাবে বলে চলল, করেন বই কি।

তিনি নিজেই তাঁর মালিক—সেখানে কারো খবরদারী তিনি সহ্য করবেনা না।

দীনেশের বিস্মিত চকিত মুখ মুহূর্তে বেদনায় পাংশু হয়ে গেল। অস্বাভাবিক, অপরিচিত আর দুর্বল গলায় দীনেশ বললে, বেশ, সেই ভালো। তিনি যা মনে করেন, তাই হবে।

তারপর ধীরে ধীরে বালিশে মাথা দিয়ে দীনেশ লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ল।

কিন্তু এতক্ষণে চমক ভাঙল গার্গীর—এতক্ষণে লজ্জায় সে ম্লান হয়ে গেল। কী হল—এ কী হল!

দীনেশের বেদনার্ত পাংশু মুখ আর শান্ত-সংযত গলার স্বর তার সমস্ত অসংযত উত্তেজনাকে যেন চাবুক মারতে লাগল।

ঘরের মেঝেতে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল গার্গী।

দশ

শাহারানপুরেই চলে গেলেন গায়ত্রী।

দীনেশ আর একটি কথা বললে না, প্রশ্ন তুলল না একবারের জন্যও। এমন কি রাত্রের ব্যাপারটার বিন্দুমাত্র প্রতিক্রিয়াও তার মধ্যে হয়েছে কিনা সেটা বোঝবার সুযোগ পর্যন্ত সে দিল না গার্গীকে। পুরোনো হিসেবের খাতার মতো কাশীর ঘটনাকে সরিয়ে রেখে নতুন খাতা খুলল দীনেশ। কলকাতা, ব্যবসা-বাণিজ্য, ঘড়ি-বাঁধা নিয়মে দিনের প্রতিটি কাজ। এমনিতেই বিনা প্রয়োজনে কথা বলবার অভ্যেস তার নেই বললেই চলে—ইদানিং যেন রীতিমত বাক্‌সংযমের সাধনা করছে সে।

দৈনন্দিনের তাগিদে সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন করে গার্গী, সংক্ষিপ্ততর উত্তর দেয় দীনেশ। অথচ একেবারে অনাসক্ত যে তাও নয়। শুভোর মুখের দিকে তাকিয়ে স্নেহে দীনেশের চোখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, ছেলের জন্যে কোনো

আয়োজন-উপকরণের ত্রুটি তার নেই। হিসেবী মানুষ রোজ বেনিয়ানের পকেটে ভরে খেল্‌না নিয়ে আসে। আর শুধু শুভোই বা কেন? গার্গীই কি কখনো টের পেয়েছে কোনো অভাব—কোনোখানে এতটুকু কার্পণ্য? দামী কাপড়ে তার বাক্স ছাপিয়ে ওঠে, পয়লা বৈশাখে আর পূজোয় একখানা করে নতুন গয়না আসে নির্ভুল নিঃসংশয় নিয়মে।

বাস্তবিক, গার্গী ছাড়া আর কোনো মেয়ে হ'লে সুখী হত এই সংসারে। কোনো অভিযোগ করত না, বিন্দুমাত্র প্রতিবাদ তুলত না কোনোদিন। প্রচুর স্বাচ্ছন্দ্যে দিবানিদ্রা দিয়ে, পান চিবিয়ে মোটা হয়ে উঠত, কাঁধ পর্যন্ত ঝল্‌মল্‌ করত ভারী ভারী গয়না। থিয়েটারে যাওয়া হোক বা না হোক, প্রতি রবিবারে ট্যাক্সি করে কালীঘাটে নিয়ে যেত, দেখিয়ে আনত পরেশনাথের মিছিল, বিজয়ার দিন বিসর্জন দেখাতে নিয়ে যেত গঙ্গার ঘাটে, চাই কি একবার বৈদ্যনাথ কিংবা পুরীতে নিয়ে তীর্থ দর্শনও করিয়ে আনতে পারত।

তাই দুর্ভাগ্য দীনেশেরও। তার মনের মতো মেয়ের অভাব ছিল না বাংলা দেশে। অন্নপূর্ণার পছন্দ আর দীনেশের পছন্দ যে এক নয়, এই সহজ সত্যিটুকু অস্বীকার করার ঋণ আজ শোধ করতে হচ্ছে। শুধু গার্গীকে নয়—দীনেশকেও।

কিন্তু জীবন তো রফা করেই চলে। সমস্ত বিশৃঙ্খলার মধ্যেও নিজের জন্যে একটা সামঞ্জস্য করে নিতে পারে সে। সব কিছু বেসুরের ভেতর দিয়েও তুলতে পারে ঐকতান। নব্বুই ভাগ অসঙ্গতিকে ভুলে গিয়ে বাকী দশ ভাগ দিয়ে আপোস করে নিতে পারে। কতটুকু সে পেয়েছে, তাই নিয়েই খুশি থাকতে চায়; কতখানি সে পেল না—তার শূন্যতার সামনে দাঁড়িয়ে হাহাকার করতে তার প্রবৃত্তি হয় না। বেঁচে থাকাই কি সম্ভব হত তা নইলে?

অতএব দীনেশের দোকান রইল, আর গার্গীর রইল শুভো; অন্নপূর্ণা রইলেন মাঝখানে। একবার কাশী, একবার কলকাতা। এর মধ্যে সময় চলল সূর্য-পরিক্রমের পথ দিয়ে, একটু একটু করে অন্নপূর্ণার চুল পাকতে লাগল, দীনেশের মাথার ওপর একটি টাক আসন্ন হয়ে এল, গার্গীর তারুণ্যের

ওপর নামতে লাগল গাম্ভীর্যের ঘন ছায়া, আর হামাগুড়ির পালা শেষ করে হাফপ্যাণ্ট পরল শুভো।

শাহারানপুর থেকে গায়ত্রীর চিঠি আর নিয়মিত আসে না—ন'মাসে ছ'মাসে একখানা। হিমালয়ের কোন্ এক সাধুর কাছে দীক্ষা নিয়েছেন তিনি—গুরু-সেবা নিয়ে কাল কাটান। পুরোনো পোড়ো বাড়িতে চন্দ্রশেখরের স্পিনোজার পাতায় উই ধরে; হরিশ্চন্দ্রঘাটের ফাটল ধরা প্রাচীন সিঁড়ি-গুলোর ওপর আরো নিবিড় হয়ে পড়ে গঙ্গার মাটি, কেদার-বিশ্বনাথের মন্দিরে ভক্তদের নামাঙ্কিত পাথরগুলো যাত্রীদের পায়ে পায়ে আরো অনেকখানি করে ক্ষয়ে আসে; আর সেই সঙ্গে চন্দ্রশেখরের স্মৃতিও মনের পলি মাটিতে হারিয়ে যায়, ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে মিলিয়ে যায় ভরাট গম্ভীর গলায় তাঁর সেই আবৃত্তি:

"সমুদয় মানবের সৌন্দর্যে ডুবিয়া
হও তুমি অক্ষয় সুন্দর,
ক্ষুদ্র রূপ কোথা যায় বাতাসে উবিয়া
দুই চারি পলকের পর!"

গার্গীই কি এই পংক্তিগুলো নির্ভুলভাবে মনে করতে পারে আজ আর? পারে গার্গী?

—বৌমা—

একটা ডাক দিয়ে অন্নপূর্ণা ঘরে ঢুকলেন।

হাতের কাজ থেকে চোখ না তুলেই গার্গী বললে, কী বলছেন মা?

অন্নপূর্ণা কিছুক্ষণ ভ্রূকুটি করে তাকিয়ে রইলেন। তারপর জিজ্ঞেস করলেন, এসব কী?

—খোকার নার্সারি।

—সে আবার কী?—অন্নপূর্ণার মুখে সন্দিগ্ধ ভ্রূকুটি লেগেই রইল।

—মানে, খেলার ঘর। খেলতেও পারবে, শিখতেও পারবে।

—ওঃ, তাই নাকি?—অপ্রসন্ন ভঙ্গিতে অন্নপূর্ণা বললেন, কিন্তু আমরাও

তো ছেলেপুলে মানুষ করেছি বৌমা। এত সব এলাহী কাণ্ড-কারখানা তো কোনো দিন করতে হয়নি আমাদের।

—আজকাল এসব রেওয়াজ হয়েছে মা—খেলনাগুলো সাজাতে সাজাতে গার্গী জবাব দিলে।

—কি জানি মা, আজকালকার ব্যাপার, তোমরাই ভালো বোঝো। বাপের টাকা আছে, খরচ হচ্ছে ছেলের জন্যে। কিন্তু তবুও বলি বৌমা, এসব না করেও ছেলে মানুষ করা যায়।

গার্গীর হঠাৎ বিরক্তি বোধ হল। এ বাড়িতে আসবার পর থেকে গার্গী কোন দিনই সম্পূর্ণভাবে শ্রদ্ধা করতে পারেনি অন্নপূর্ণাকে—এই সাত বছর পরেও না। প্রথম দিকে কেমন লুকিয়ে বেড়াতেন, আজকাল তো পুজোর ঘরের দুর্গেই বেশ নিরাপদ আশ্রয়টি তৈরী করে নিয়েছেন। যে স্পর্ধারে সঙ্গে গার্গীকে ঘরে এনেছিলেন, তার লেশমাত্রও পরে দেখাতে পারেন নি তিনি; গার্গীকে জোর করে এনেছেন, কিন্তু সে জোর দিয়ে একটুখানি আশ্রয় গড়ে দিতে পারেন নি তাকে।

এবং বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই এসব হীনম্মন্যতার যা পরিণাম ঘটে, অন্নপূর্ণারও তাই হয়েছে। গার্গী জানে, দীনেশের বিরূপতা সঞ্চারিত হয়েছে অন্নপূর্ণার মধ্যেও—হয়তো দীনেশের চাইতে বেশিই। নিজের একান্ত অক্ষমতাকে আর কি উপায়ে তিনি সান্ত্বনা দেবেন? তাই মনে মনে বলেছেন, তিনি তো বিয়ে দিয়েছিলেন ঠিকই, কিন্তু বৌ-ই স্বামীর মনের সঙ্গে মানিয়ে চলতে পারল না। তার জন্যে দায়িত্ব কি তাঁর?

সেইজন্যে অন্নপূর্ণার এ ধরনের গায়ে পড়া সদুপদেশ তাকে হঠাৎ তিক্ত করে তুলল।

—মানুষ করা যাবে না কেন মা, লেংটি পরেও কি লোকের দিন কাটে না? কিন্তু অভাব যার নেই, মিথ্যে কষ্ট করতে সে যাবে কেন? দুঃখে ধান্দায় নিছক হা-ঘরের মতো দিন না কাটিয়ে সে নয় বড়লোকের মতোই মানুষ হোক।

অন্নপূর্ণার মুখ কালো হয়ে উঠল: সে তো বটেই বৌমা—বড়লোকের

ছেলে, গরবীয়ানা করবে কেন? তবে এখন থেকেই অত বেশি আদর দিলে ছেলে মানুষ হবে কিনা সেটাও ভেবে দেখো।

একবার জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে করল, নিজের ছেলেকেও কি এইভাবে মানুষ করেছেন মা? কিন্তু দীনেশের সঙ্গে যদি বা ঝগড়া করা চলে, অন্নপূর্ণার সঙ্গে কথা কাটাকাটি করতে প্রবৃত্তি হয় না।

শান্ত গলায় গার্গী বললে, সে আমি দেখব মা। আপনি ভাববেন না।

—বেশ—বেশ!—অন্নপূর্ণা ঠোঁট বাঁকালেন, কিন্তু তিনিও আর কথা বাড়ালেন না। তারপর আলোচনার মোড় ঘুরিয়ে নিয়ে বললেন, একটা কাজের জন্যে এসেছিলাম বৌমা।

—বলুন।—ছোট টেবিলের ওপর গার্গী ফলগুলো সাজাতে লাগল।

—একবার দ্বারকাধাম দর্শন করে আসব ভেবেছি। হাজার খানেক টাকার দরকার আমার।

সে আমাকে বলবার কী আছে?—গার্গী মাথা তুলল: টাকা তো আপনারই মা। আপনার ছেলেকে বললেই চলবে।

—না বৌমা, দিন বদলেছে—অন্নপূর্ণা বিষাদ স্বরে বললেন, তোমারই এখন ঘর-সংসার। গিন্নীর অনুমতি নইলে তো হবে না। তুমি একবার দয়া করে বোলো দীনেশকে। বয়েস বাড়ছে—বেশিদিন আর বাঁচব না। মরবার আগে দ্বারকানাথ একবার দেখে আসতে চাই। তিন ধাম হয়েছে, এখন চতুর্থ ধাম হলেই আর খেদ থাকে না।

অন্নপূর্ণা আর দাঁড়ালেন না। গার্গীকে অপ্রত্যাশিত একটা ঘা দেবার নিষ্ঠুর আনন্দ নিয়েই বেরিয়ে গেলেন সামনে থেকে।

টেবিলের যেখানে হাত ছিল, সেখানেই রইল গার্গীর। কী আশ্চর্য—কতদিন ধরে এমন করে ঈর্ষ্যায় জ্বলছেন অন্নপূর্ণা? মাঝে মাঝে তাঁর মুখে স্পষ্ট বিরাগের ছায়া অবশ্য দেখেছে সে, কিন্তু মনের ভেতরে অন্নপূর্ণা এ কী অর্থহীন জ্বালা আর ক্ষোভ বয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছেন! কিন্তু কেন এই ঈর্ষ্যা? দীনেশের সংসারে অন্নপূর্ণা কখনো নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে পারেন নি বলেই

কি ? হঠাৎ গার্গীর হাসি এল। যাক, তা হলে কোনো না কোনো দিক থেকে সেও কারো কারো ঈর্ষ্যার পাত্রী !

কিন্তু একটা কথা ঠিক। দীনেশ কর্তব্যপরায়ণ—হয়তো যান্ত্রিক ভাবেই কর্তব্যপরায়ণ। কাজেই এ বাড়ীতে স্ত্রী হিসেবে যতটুকু মর্যাদা গার্গীর প্রাপ্য, দীনেশ তাকে বঞ্চনা করেনি তার থেকে। আরো, শুভো আসবার পর থেকে গার্গী যেন একটা নতুন মূল্যে মূল্যবতী হয়ে উঠেছে দীনেশের কাছে। পুত্রের জন্যেই ভার্যা এবং পুত্র-গর্বিত দীনেশ ভার্যাকে তার যথাযোগ্য স্বীকৃতিও দিয়েছে। তাই বাড়ীর সিন্দুকের চাবি দীনেশের কোমর থেকে গার্গীর হাতবাক্সে এসে উঠেছে এবং শুভোর জন্যে এই যে অপব্যয়-পর্ব চলেছে, তার জন্যেও দীনেশের দুর্ভাবনা নেই।

চোখ টাটাচ্ছে আর একজনের। আর একজন উপবাসীর বুক টনটনিয়ে উঠছে। অন্নপূর্ণা সহ্য করতে পারছেন না। তাই দ্বারকানাথে যাওয়ার টাকা চাইবার উপলক্ষ্যে গার্গীর ওপর খানিকটা বিষ বর্ষণ করে গেলেন তিনি।

গার্গীর মুখ শক্ত হয়ে উঠল। আর নয়। আর সে রফা করবে না। জীবনে আর কিছু নাই-ই যদি জুটে থাকে, অন্তত তার লৌকিক অধিকারটা সে ছেড়ে দেবে না কোনোমতেই। যা খুশি মনে করতে পারেন অন্নপূর্ণা।

ঝিয়ের সঙ্গে পার্ক থেকে বেড়িয়ে ফিরল শুভো। সিঁড়িতে তার ছোট ছোট পায়ের শব্দ শুনতে পাওয়া যাচ্ছে। নার্সারি গোছানো রেখে গার্গী উঠে পড়ল।

রাত্রে বিছানায় আধশোয়া অবস্থায় দীনেশ পান চিবোচ্ছিল। কাছে এগিয়ে এসে গার্গী বললে, মাকে হাজার খানেক টাকা দিতে হবে।

—মাকে ?—দীনেশের দৃষ্টিতে বিস্ময় উছলে পড়ল।

—আমার মাকে নয়, তোমার মাকেই। ভয় নেই—গার্গী ছোট একটু টিপ্পনী কাটল।

দীনেশের স্বর হঠাৎ গম্ভীর হয়ে উঠল : যাকে আমি মা বলে ডাকি, তাঁকে

মার মর্যাদাই দিই। তাঁর সঙ্গে রক্তের সম্পর্ক কি আছে না আছে, সে বিচার আমি কখনো করিনি। সে অভ্যেস আমার নেই।

গার্গী একবার থমকে গেল, লজ্জাও পেল। তারপর বললে, মা একবার দ্বারকায় যেতে চান। হাজার খানেক টাকা ওঁর দরকার হবে পথ-খরচা।

দীনেশ অদ্ভুতভাবে তাকালো: সে কথা আমাকে না বলে তোমার কাছে দরবার করা কেন?

—সে তুমি মাকেই জিজ্ঞেস কোরো।

—তাই করব।—মুখের পানটা দীনেশ পিকদানির মধ্যে ফেলে দিল: কিন্তু মা যাবেন কার সঙ্গে? আমার পক্ষে তো দোকান ফেলে অতদূর যাওয়া সম্ভব নয়। আর যার-তার সঙ্গে মাকে পাঠাতেও আমি পারব না।

—কাশীর বাড়ীর সরকার মশাই যেতে পারেন। তিনি পুরোনো লোক—সঙ্গে থাকলে ভাবনার কিছু নেই।

—বটে—বটে!—দীনেশ বাঁকা দৃষ্টি ফেলল একটা: সবই তো হয়ে গেছে দেখছি, এখন আমাকে জিজ্ঞাসা করা নেহাৎ একটা ভদ্রতা মাত্র। তা বিলি-ব্যবস্থাটা করে ফেলল কে? তুমিই নাকি?

স্বচ্ছন্দেই বলা যেত, এ সম্বন্ধে কিছুই আমার জানা নেই, শুধু খবরটুকু বলে দেওয়াই আমার কাজ। কিন্তু দীনেশের প্রশ্ন করার ধরনের মধ্যে এমন একটা কিছু আছে, যা আর এখন কিছুতেই সহ্য করা যায় না। ঘা খেতে খেতে একদা যে-গার্গী প্রায় ধূলোয় লুটিয়ে পড়েছিল, অকস্মাৎ সে স্পর্শ-সজাগ হয়ে উঠেছে অতিমাত্রায়। এখন যেন আক্রমণের পালাটা আসছে গার্গীর পক্ষ থেকেই। অথবা শুভো আসবার পর থেকেই সে যেন নতুন কোনো অবলম্বন পেয়েছে, নতুন একটা জোর পেয়েছে কোথাও। সেই জোরটা অবচেতন ভাবে দীনেশও অনুভব করছে, তাই নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধেই অনেকখানি অধিকার ছেড়ে দিয়েছে গার্গীকে। কিন্তু গার্গী আর ওইটুকুতেই থামতে চায় না! আর ভিক্ষার মূর্তি নয়। দীনেশ যখন গৃহিণীরূপেই তাকে চায়, তখন সে পরিপূর্ণ গৃহিণীই হয়ে উঠবে। এখন আর এতটুকু তুচ্ছতাও

তার সইবে না, তার ষোলো আনাই আদায় করে নেবে কড়ায় গণ্ডায়। তাই গার্গী বললে, হাঁ, আমিই ঠিক করেছি।

—তুমিই?—দীনেশ উঠে বসল। চকিত হয়ে উঠল চোখ।

—আমিই।—গার্গীর স্বর কঠিন হয়ে এল: তিনি তোমারও মা, আমারও মা।—অন্নপূর্ণার ওপরে একটা বিস্বাদ অপ্রীতি বয়েও গার্গী বলে চলল: তাঁর জীবনের শেষ সাধটা মেটানোর দায়িত্ব আমারও।

—তাই নাকি?

দীনেশ হঠাৎ হেসে উঠল—অস্বাভাবিক, অবিশ্বাস্য ভাবে হেসে উঠল। পাশের বেবি-কটে ঘুমন্ত শুভো চমকে উঠল সেই অসঙ্গত হাসির শব্দে।

যেন একটা বিরাট প্রহসনের অভিনয় দেখছে, এমনিভাবে হাসতে হাসতেই দীনেশ বললে, আচ্ছা বেশ, তাই হবে। গিন্নীর আদেশই শিরোধার্য।

কিন্তু এবারেও কি দীনেশের পরাজয়? স্তম্ভিত বিহ্বল গার্গী মনের কাছে তো উত্তর খুঁজে পেল না!

এগারো

দীনেশ—গার্গী, গার্গী—দীনেশ। মাঝখানে রইল শুভো। তারপর দিন কাটতে লাগল, মাস কাটতে লাগল, বছর কেটে যেতে লাগল। কলকাতায় চোখ বুজলেন অন্নপূর্ণা—গায়ত্রী শাহারানপুরে। মৃত্যুর সময় কাশীর বাড়ীতে এসেই শেষ নিশ্বাস ফেলবার আকাঙ্ক্ষা ছিল গায়ত্রীর—কিন্তু সে সাধ মেটাবার সুযোগ তিনি আর পেলেন না। দূর সম্পর্কের এক ভাইপো এসে প্রায় জোর করেই দখল করলো কাশীর বাড়ি। দীনেশ মামলা করতে চেয়েছিল, কিন্তু বাধা এল গার্গীর কাছ থেকেই: কী হবে ও বাড়ি দিয়ে? ওরাই নিক।

দীনেশ গোঁ গোঁ করে উঠেছিল: প্রশ্নটা বাড়ির ভ্যালুয়েশন নিয়ে নয়—এ

হল ন্যায্য দাবির ব্যাপার। বাড়ি ভোগ-দখল করো না করো সে আলাদা কথা, কিন্তু অধিকার ছেড়ে দেবে কেন?

—যাঁদের জন্যে ও বাড়িতে আমার অধিকার ছিল, তাঁরাই যখন নেই তখন আর ও নিয়ে বিবাদ করতে আমার প্রবৃত্তি হয় না।

—এসব বাজে সেন্টিমেন্টের কোনো মানেই নেই—বিরক্ত হয়ে দীনেশ চলে গিয়েছিল। ব্যাপারটাও চুকে-বুকে গিয়েছিল ওখানেই।

সময় চলতে লাগল তারপরে। কড়া চামড়ার নতুন জুতো প্রথম পায়ে দিতে রক্তারক্তি ঘটে বটে, কিন্তু সেটা যেমন সহজ হয়ে আসে, দীনেশ আর গার্গীর সম্পর্কটা দাঁড়ালো ঠিক সেই রকম। গার্গীর রইল সংসার—দীনেশের রইল দোকান। দুজনের ভেতরে কর্তৃত্বের একটা সীমারেখা নির্ধারিত হয়ে গেল—নির্ণীত হয়ে গেল একটা স্বতন্ত্র জগৎ। এই দুই জগতের যোজক হয়ে রইল শুভো—শুভেন্দু। চন্দ্রশেখরের রক্তের ধারা স্পষ্ট-প্রকট হয়ে উঠল শুভেন্দুর মধ্যে, বাপের মতো স্কুলের প্রত্যেক ক্লাসে সে হোঁচট খেল না—রেসের ঘোড়ার মত টপাটপ টপকে চলল সকলের আগে আগে।

গার্গীর শরীর আরো ভারি হয়ে এল—এখন প্রায় মোটাই বলা যায় তাকে। টাকের দুধারে দীনেশের রগের চুলগুলো প্রায় আধাআধি পেকে এল। ব্লাড-প্রেসারের লক্ষণ দেখা গেল তার মধ্যে—তাকে উত্তেজিত হতে বারণ করে গেলেন ডাক্তার। পরপর চারখানা নতুন ভাড়াটে বাড়ি তুলল দীনেশ, কুড়ি বছর আগে শেষ মিলিয়ে যাওয়া ল্যাণ্ডো গাড়ির শূন্য জায়গায় এতদিনে মোটরও এল একখানা। কিন্তু ব্যবসায়ী দীনেশ পারৎপক্ষে এখনও ট্রামেই চলাফেরা করে। গাড়িটা স্কুলে দিয়ে আসে শুভোকে—গার্গীকেও কখনো কখনো গাড়ি করে সামাজিকতা রাখতে যেতে হয়।

ওদিকে বন্ধু মন্মথ দাশগুপ্তেরও পশার বাড়ল। হাইকোর্টের একজন জাঁদরেল অ্যাডভোকেট এখন মন্মথ। লঘু-চালে চলা রসিক মন্মথকে এখন আর চেনাই যায় না প্রায়। লম্বা চেহারায় প্রচুর মাংস আর চর্বি লেগেছে—এখন একটা দৈত্যের মতো দেখায় তাকে; তার ব্যক্তিত্বের সামনে জুনিয়ার

ব্যারিস্টারেরা থমকে যায়, ঝিমধরা বিচারপতি মন্মথের আর্গুমেণ্টের সময় চকিতভাবে সোজা হয়ে উঠে বসেন। কিন্তু বাইরে যতই কঠিন আর গম্ভীর হোক—দীনেশের কাছে এলেই সে যেন আবার কৈশোর-যৌবনের চপলতার মধ্যে ফিরে যায়।

—কি হে লক্ষ্মীপ্যাঁচা—টাকার আমদানী কি রকম?

—আঃ, থামো, থামো।—দীনেশ বিব্রত হয়ে ওঠে: চারদিকে কর্মচারীরা রয়েছে—কী ভাববে?

—কী আবার ভাববে?—মন্মথ মোটা হাভানায় টান দেয়: ওরা জানে। আড়ালে আড়ালে ওরা তোমায় যা বলে তা লক্ষ্মীপ্যাঁচার চেয়ে সুভাষিত নয়।

—কী বলে?

—নিতান্ত আমার কাছ থেকেই শুনবে? তবে শোনো, ওরা তোমায় বলে যখ, বলে টাকার কুমীর, বলে তোমার চোখের চামড়া নেই—সংসারে খালি টাকাই তুমি চিনেছ।

দীনেশ আজকাল সহিষ্ণু হয়ে গেছে—হাসে। বলে, আর তোমার মক্কেলরা কী বলে? তাদের মতে তুমি খুনে উকিল, তোমার খপ্পরে গেলে আর নিস্তার নেই—হাড়-মাংসশুদ্ধ খেয়ে তুমি ছিবড়ে করে দাও।

হা-হা করে হেসে ওঠে মন্মথ: যাক শোধবোধ। তোমার সঙ্গে আর কথা বলে পারা যাবে না দেখছি। চুল পাকার সঙ্গে এ্যাদ্দিনে তোমার মাথা পাকল—জবাব দিতে শিখেছ।

ভরা বর্ষাকাল। সকাল থেকেই আকাশ মেঘলা করে ছিল, দুপুরের দিকে নামল একেবারে ধারাবর্ষণ। কলকাতার রাস্তা ভাসানো প্রবল বৃষ্টি। দোকানে বেচা-কেনা কম—দু-একটা জরুরি পার্টি তাদের কাজ শেষ করে চলে গেছে। শরীরটা একটু ভার ভার ঠেকছিল দীনেশের—মনে হচ্ছিল ভেতরে চাপা সর্দি হয়েছে একটা। এক পেয়ালা আদা চা খেতে খেতে দীনেশ ভাবছিল, আজ তাড়াতাড়ি বাড়ী ফিরলে মন্দ হয় না। গাড়ীটা পাঠাবার জন্যে একটা টেলিফোন করে দিলে হয় বাড়িতে।

এমন সময়—আকাশ-ভাঙা সেই বৃষ্টির মধ্যে মন্মথের মস্ত শাদা গাড়িখানা দীনেশের দোকানের সামনে এসে থামল। প্রকাণ্ড একটা লাফ দিয়ে ভেতরে ঢুকল মন্মথ—বিখ্যাত অ্যাডভোকেট এম, এন, দাশগুপ্ত এমন করে লাফাতে পারে এ দৃশ্য দেখলে লজ্জায় মরে যেতো তার জুনিয়ারেরা।

দীনেশ চমকে উঠল।

—ব্যাপার কী, লাফাচ্ছ কেন ওরকম?

মন্মথের সমস্ত মুখ জ্বলজ্বল করছিল আনন্দে: লাফাব কেন—নাচব এইবারে।

—নাচবে মানে? এই বুড়ো বয়সে নাচবে? পাগল হয়ে গেলে নাকি হঠাৎ?

মন্মথ ধপ করে বসে পড়ল: তুমি একটি গবেট।

—তা না হয় হলাম। কিন্তু আমি গবেট বলেই তুমি নাচতে থাকবে—এতটা খুশির কী কারণ থাকতে পারে?

মন্মথ বললে, হুম্। আগে পঞ্চাশটা টাকা দাও।

—পঞ্চাশ টাকা? কী হবে?

—দাও আগে—তারপরে বলছি।

দীনেশ হেসে ক্যাশ বাক্স থেকে টাকা বের করে এগিয়ে দিলে মন্মথের হাতে। মন্মথ অভ্যস্ত অ্যাডভোকেটীয় রীতিতে অনাসক্ত ভঙ্গিতে টাকাটা পকেটে পুরে ফেলল। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে বললে, আসি। ব্যবস্থাটা করে ফেলি চটপট।

—দাঁড়াও—দাঁড়াও! ব্যাপারখানা কী? এই বৃষ্টির মধ্যে হঠাৎ এসে পঞ্চাশ টাকা আদায় করার মানে কী, আর যাচ্ছই বা কোথায়?

—তার মানে হল, তোমার বাড়ীতে আজ সন্ধ্যায় বেশ ভালো মত একটা ভোজ হবে। অতিথি হচ্ছি আমি, আমার স্ত্রী, আমার মেয়ে সুলতা। তারই বিলি-ব্যবস্থা করতে যাচ্ছি তোমার স্ত্রীর কাছে।

দীনেশ হাসল: খাবে—সে বেশ তো! খুব খুশি হবো। কিন্তু হঠাৎ এই

আয়োজন—এর একটা উপলক্ষ্য তো আছে। তা ছাড়া আমার বাড়িতে খাবে—তার জন্যে ব্যবস্থা তুমি করবে কেন? সে দায়িত্ব তো আমার।

—দায়িত্ব তোমার—মন্মথ ভ্রূকুটি করল: দায়িত্ব বলে কোনো বোধ তোমার আছে নাকি?

—গাল দিচ্ছ কেন খামোকা?

মন্মথ বললে, তবে শোনো। তোমার শুভেন্দু বলে একটি ছেলে আছে, জানো?

—জানতাম বলেই তো আমার ধারণা।

—আমার স্নলতা বলে একটি মেয়ে আছে—শুনেছ কখনো।

—শুনিনি, তবে জন্মাবার পর থেকেই তাকে দেখে আসছি। কালকেও দেখেছি।

—যাক—নিশ্চিন্ত হলাম।—মন্মথ গম্ভীর হয়ে বললে, তোমার জানা দরকার, এরা দুজনেই এবার দুটি স্কুল থেকে একসঙ্গে ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিয়েছিল।

দীনেশের বুদ্ধিটা এইবারে স্বচ্ছ হয়ে এল। হেসে বললে, বুঝেছি। রেজাল্ট্ বেরিয়েছে বোধ হয়। তা পাশ করেছে তো ওরা?

মন্মথ আবার ভ্রূভঙ্গি করলে: আমার মেয়ে ফেল করবে—তার সম্বন্ধে তোমার এমন অশ্রদ্ধা হল কোত্থেকে? শুধু পাশই করেনি—একটা জুনিয়ার স্কলারশিপও পাবে। কিন্তু শুভো—মন্মথ বিষণ্ণ হয়ে গেল।

—শুভো?—দীনেশের মুখ চকিতে কালো হয়ে উঠল: শুভো কী?

—মাত্র দু নম্বরের জন্যে—মুখ আরো করুণ করে থেমে গেল মন্মথ।

—দু নম্বরের জন্যে ফেল করেছে?—দীনেশ আর্তনাদ করে উঠল: মাত্র দু নম্বরের জন্যে?

—আঃ—চ্যাচাচ্ছ কেন গাড়োল কোথাকার? আমি বলেছিলাম—শুভো মাত্র দু নম্বরের জন্যে ইউনিভার্সিটিতে সেকেণ্ড্ হয়ে গেল, নইলে ফার্স্ট হত।

—শুভো সেকেণ্ড্ হয়েছে ইউনিভার্সিটিতে?—দীনেশের শরীরে বিদ্যু

খেলে গেল। সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়ালো সে। পায়ের ধাক্কায় উল্‌টে পড়ে গেল আদা-চায়ের পেয়ালা।

—সত্যি বলছ মন্মথ?

—নিরাশ হয়েছ, না? তোমার মতো লোহাওয়ালার ছেলে হয়েও ইউনিভার্সিটিতে সেকেণ্ড্ হল—ভারী অন্যায়, কী বলো হে?

খোঁচাটা দীনেশ আর গায়ে নিলে না। দু'পা এগিয়ে এসে কাঁপা গলায় বললে, তা হলে আরো একশো টাকা দিচ্ছি। বন্ধু-বান্ধব সকলকে ডাকা হোক—

—উঁহু, তোমার পর্দানশীন বাড়ীতে অ্যামং আওয়ার-সেল্‌ভ্‌স্। ওটা পরে হবে আমার বাড়ীতে—

বাইরে তখনো সমান বৃষ্টি। তারই মধ্যে মন্মথ এগোল গাড়ির দিকে। দ্রুত আর ত্রস্ত পায়ে পেছনে পেছনে নামতে নামতে দীনেশ বললে, দাঁড়াও—দাঁড়াও—আমিও সঙ্গে যাব।

রাত্রে প্রচুর খাওয়া-দাওয়ার পর আসর বসল তেতলার হলঘরে।

ঘরটার এখন আর ব্যবহারই নেই—তালাবন্ধই থাকে সব সময়ে। কিন্তু দীনেশের বাবার আমলে এ ঘর জমজমাট হয়ে থাকত। স্বর্গীয় মৈত্র মশায়ের এইটিই ছিল অন্দরের বৈঠকখানা—তাঁর দেওয়ান-ই-খাস। দীনেশকে দেখে তাঁর সম্বন্ধে কোনো রকম অনুমান করাই সম্ভব নয়। সন্ধ্যার পরে বন্ধু-বান্ধব জুটিয়ে তিনি চিৎকার করে পাশা খেলতেন, মাঝে মাঝে বসতো গান-বাজনার আসর। নিজে বীণা বাজাতেন, তবলায় চাঁটি মারারও অভ্যাস ছিল তাঁর। এ ঘর সেদিন সজীব আর সজাগ হয়ে থাকত। কিন্তু দীনেশের আমল থেকেই ঘরটায় শক্ত লোহার তালা পড়েছে। সপ্তাহে একদিন তালা খুলে ঢোকে চাকরেরা, ঝাড়ন দিয়ে পরিষ্কার করে ঝাড়বাতি, দেওয়ালের বড় বড় ছবিগুলো—ধুলো ওড়ায় কার্পেটের। শুধু এক কোণার ছেঁড়া-ভাঙা বাদ্যযন্ত্রগুলোতে কেউ হাত দেয় না—ওরা যথাস্থানে নির্বাসিত আর অনাদৃত হয়েই পড়ে আছে।

বহুদিন পরে আবার আজকের বিশেষ উপলক্ষ্যে আলো জলেছে এই ঘরে। দেওয়ালের ছবিগুলো হাসছে—আট ইঞ্চি চওড়া গিল্‌টি ফ্রেমের বিশাল আয়নার অস্বচ্ছ কাচের মধ্যে স্মৃতির আলো ঝলমলিয়ে উঠেছে যেন। প্রকাণ্ড একটা হাভানা ধরিয়ে মন্মথ তাকিয়ায় এলিয়ে পড়ল।

—মনে হচ্ছে, এ বাড়িতে একটা বিরাট পরিবর্তন আসছে।

—কেন?—তৃপ্ত মুখে দীনেশ জানতে চাইল।

—এতদিনের বন্ধ এই ঘরখানা খোলার বিশেষ একটা তাৎপর্য আছে। মনে হচ্ছে, এতদিন পরে আবার মৈত্র বাড়ির দরজাটাও খুলে গেল।

—কেন, বন্ধ ছিল নাকি?—সোনার চশমার ঝিলিক হেনে প্রশ্ন করল মন্মথের সুবেশা স্ত্রী সুরমা।

—বন্ধ ছাড়া আর কী! না ছিল হাসি, না ছিল গান—শুধু দীনেশ লোহার সিন্দুক খুলে তার অতলগর্ভ অন্ধকারে ঠেলে দিচ্ছিল তাড়াতাড়া নোট। অথচ, আমাদের ছেলেবেলায় এই ঘরে কত বড় বড় ওস্তাদের গান শুনেছি—এখানে এসে গেছেন রাধিকা গোস্বামী, গোপেশ্বর বাঁড়ুয্যে, এখানে বসে স্বদেশী গান শুনিয়ে গেছেন ময়মনসিংহের ব্রজেন গাঙ্গুলী। আবার ঘর খুলল। হাওয়া বদলালো, কী বলো দীনেশ?

দীনেশ হঠাৎ অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিল। ছেলেবেলার কতগুলো দিন স্বপ্নের মতো ভেসে উঠেছিল মনের সামনে—যেন ছবির মতো দেখা যাচ্ছিল, এই ফরাসে—এইখানে বসে বীণ বাজাচ্ছেন বাবা, তাঁর দ্রুতচারী আঙুল থেকে আংটির দীপ্তি বীণের উজ্জ্বল তারগুলোর ওপর দিয়ে বিদ্যুতের মতো চমকে চলেছে।

দীনেশ তখনি কোনো জবাব দিলে না। যেন কথাটা সে ভালো করে শুনতে পায়নি।

গার্গীর যেন হঠাৎ একটা খোঁচা লাগল বুকের মধ্যে। হঠাৎ কোথা থেকে আঘাত লাগল শুকনো ক্ষতের ওপর। দিন বদলাবে! হয়তো বদলাবে। আজ শুভো যেমন করে এ বাড়িতে নির্বাসিতা সরস্বতীকে

ফিরিয়ে এনেছে—হয়তো তেমনি করেই নতুন কালের মুক্ত আলো এসে পড়বে এখানে। কিন্তু জানালা দিয়ে দেখা বয়ার বন্ধনে শৃঙ্খলিত গঙ্গায় আর কাশীর নীলধারা উজিয়ে আসবে না—গার্গীর যে দিনগুলো ফোটার আগেই ধূলোয় ঝরে গেল, সে দিনগুলো ফিরে আসবে না আর। তার লেখার খাতার ছাইয়ের কণাগুলো আজ কোথায় নিশ্চিহ্ন হয়ে মিলিয়ে গেছে—কেউ আর তাদের খুঁজে পাবে না। হয়তো শুভো সুখী হবে; হয়তো শুভোর জীবনেই শুরু হবে একটা নতুন অধ্যায়। গার্গীর একটা চাপা নিশ্বাস পড়ল—হয়তো ঈর্ষ্যার একটা লঘু তরঙ্গও খেলে গেল বুকের ভেতরে!

সুরমার ডাক যেন গার্গীর ঘুম ভাঙালো।

—কি ভাই, হঠাৎ এত মনমরা যে? কী ভাবছ?

চোখে কি জল নেমে আসতে চাইছিল গার্গীর? নিজেকে সামলে নিয়ে বললে, না—কিছুই তো ভাবছি না।

—যাই বলো দিদি—শুভোর বাহাদুরী শুধু নিজের জন্মে নয়—দুজনের জন্মেই।—সুরমা আবার বললে।

—কি রকম?—সবিস্ময়ে দীনেশ প্রশ্ন করল।

—এই মূর্খটাকে সব ব্যাখ্যা করে বোঝাতে হয়—একেবারে লোহার হন্দরের পাকাপোক্ত হিসেবের মতো।—মন্মথ হাসল: শোনো হে নির্বোধ, তোমার ছেলে আমার মেয়ের জন্মে ফার্স্ট হওয়াটা স্যাক্রিফাইস করেছে।

—তবু বুঝতে পারছি না।

সুরমা বললে, শুভো যখনি আমাদের বাড়িতে এসেছে—অমনি মেয়েটা ওকে দিয়ে অঙ্ক করিয়ে নিয়েছে।

দীনেশ বললে, ওঃ—এই কথা! ভালোই তো করেছে।

মন্মথ বললে, না—নিজের ক্ষতি করেছে। লতার জন্মে সময় নষ্ট না করে নিজের জন্মে করলে ওই দুটো নম্বরের জন্মে ওর আটকাত না।

গার্গী বললে, বেশ তো, আই-এ তে পুষিয়ে নেবে।

—আই-এ! দীনেশ যেন চমকে উঠল: আই-এ পড়বে নাকি?

মন্মথ সশব্দে হেসে ফেলল: তবে কি লাঙল চাষ করবে?

দীনেশ জোর করে হাসতে চেষ্টা করল, কোনো জবাব দিল না। তার কপালের ওপর যেন মেঘের ছায়া ঘনিয়ে এসেছে। কী একটা বলতে চাইছে, কিন্তু বলতে পারছে না।

গার্গী সুরমাকে বললে, বেশ মেয়েটি তোমার হয়েছে ভাই। যেমন খাসা দেখতে শুনতে, লেখা-পড়াতেও তেমনি।

মাঝখান থেকে দীনেশ হঠাৎ বলে বসল: বিয়ে দিতে আর কষ্ট পেতে হবে না।

—হবে না মানে?—মন্মথ সোজা হয়ে উঠে পড়ল: বস্তির মেয়ে, সেটা খেয়াল রাখো? পণ দিতে দেড় হাত জিভ বেরিয়ে যাবে।

—টাকার অভাব কী তোমার? তার ওপর একমাত্র মেয়ে—দীনেশ মন্তব্য করল।

—বাইরেই যা কিছু দেখছ হে, ভেতরে ফাঁপা—একটা কৃত্রিম দীর্ঘশ্বাস ফেলল মন্মথ: বাইরের চাল বজায় রাখতে গিয়েই ফোঁপরা হয়ে যাচ্ছি! তুমিই বরং ভাগ্যবান। ঘরে জমিয়ে তুলেছ সোনার তাল—ওদিকে ছেলের বিয়ে দিয়েও আনবে অর্ধেক রাজত্ব আর রাজকন্যা।

—গেল কোথায় সুলতা?—দীনেশ মাথা ঘুরিয়ে খুঁজতে লাগল।

—শুভোর ঘরে বসে ক্যারাম খেলছে—গার্গী জবাব দিলে।

সুরমার চোখ দুটো চকচক করে উঠল হঠাৎ। একটা গভীর স্নেহে, একটা মৃদু কোমলতায়।

সুরমা বললে, লতা শুভোর চেয়ে মাত্র দু মাসের ছোট। কিন্তু এক জাত হলে দুজনের আমি বিয়ে দিতাম। চমৎকার মানাত!

কথাটা এমন আকস্মিকভাবে পড়ল যে ঘরের বাকী তিনজন এক সঙ্গেই চমকে উঠল। সবচেয়ে বেশি চমক লাগল গার্গীর। একটু আগে শুভোর

ঘর থেকে দুটি তরুণ কণ্ঠের মিলিত হাসির আওয়াজ কানে এসেছিল। হঠাৎ মনে হয়েছিল, তার ভেতরে নিছক কৈশোরের আনন্দের চাইতে আরো বেশি কিছু আছে—আরো অন্তরঙ্গ, আরো নিবিড়।

আবহাওয়াটাকে সহজ করে দিলে মন্মথই। হেসে বললে, এক জাত হলেও বিশেষ সুবিধে হত মনে করো না। দীনেশও খাঁটি বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ। একেবারে ঘাড় মুচড়ে পাওনা-গণ্ডা আদায় করে নিত।

স্থূল দীনেশ হা-হা করে হেসে উঠল: সে তো বটেই! তা হলে কি আর ছেড়ে কথা কইতাম! ভাগ্যিস এক জাত নও, তাই আর বন্ধু-বিচ্ছেদ হওয়ার ভয় রইল না।

সুরমা অল্প একটু হাসল, কিন্তু গার্গী আর হাসল না। এবারে মুখের ওপর মেঘের ছায়া নামবার পালা তার। দুটি কিশোর কণ্ঠের হাসির ঝঙ্কার ক্রমাগত তার কানে বাজতে লাগল—বাজতে লাগল একটা রহস্যগভীর নতুন অর্থের ইঙ্গিত নিয়ে।

বারো

সর্দি লাগবার পর থেকে দিন দুই শরীরটা একেবারেই ভালো ছিল না দীনেশের। আজ মনে হল একটু যেন জ্বরই হয়েছে তার। দোকানে আর গেল না—লঘু পথ্য করে একটা চাদর গায়ে টেনে লম্বা হয়ে শুয়ে রইল বিছানায়।

বয়েস বাড়ছে দীনেশের—সন্দেহ কী! নইলে একটুখানি সামান্য সর্দিজ্বরের জন্যে এমন কুঁড়েমি করতে তাকে দেখেছে নাকি কেউ? দেখেছে এই কুড়ি বছরের মধ্যে? একশো তিন টেম্পারেচার নিয়েও সে দোকানে বসেছে, জ্বরের ধমকে চোখ যখন টকটকে হয়ে উঠেছে, তখনো সে খাতার পাতায় নির্ভুলভাবে ঠিক দিয়েছে তার হিসেবে। কিন্তু আজ সেই হিসেবী

ব্যবসায়ীর দুরন্ত স্বর্ণ-মৃগয়ায় কোথায় যেন ছেদ পড়েছে; এসেছে মন্থরতা—এসেছে শৈথিল্য। শুধু শরীরেরই নয়, মনেরও বয়স বেড়েছে দীনেশের। একটু জিরোতে চায়, চোখ বুজে পড়ে থাকতে চায় দিন কয়েক। নেশারও একটা অবসাদ আছে—রেসের ঘোড়াকেও এক সময় এসে থেমে দাঁড়াতে হয়।

এইবার একটু ছুটি—কিছু তীর্থ-ধর্মই বা মন্দ কী এমন? একা চুপ করে শুয়ে থাকতে থাকতে মনের দিক থেকে কেমন রোমাণ্টিক হয়ে উঠতে লাগল দীনেশ। কেমন হয় একবার হরিদ্বারে গেলে? মথুরা-বৃন্দাবন তো প্রায় পথেই পড়বে। তা ছাড়া আরো দূরে জ্বালামুখী—অমরনাথ—এমন কীই বা খরচ হবে? হাজার দুই টাকার মামলা বড় জোর। না—টাকাটা খরচ করতে এখন আর খুব গায়ে লাগবে না তার। এই কুড়ি বছর ধরে লোহা আর কংক্রীট জমিয়ে সে পাকা করেছে তার ব্যবসার ভিত্তি, এখন যদি সে পঞ্চাশ হাজার টাকাও অপব্যয় করে, এতটুকু আঁচড় লাগবে না তার গায়ে।

হয়তো ক্লান্তি, হয়তো সর্দিজ্বরের প্রভাব: ঠিক বলা যায় না। কিন্তু দীনেশের আবিষ্ট চেতনার মধ্যে হঠাৎ এই রকম কতগুলো বে-আইনি ভাবনা কিলবিল করে বেড়াতে লাগল। সত্যিই তো, আর কতদিন সে এমনভাবে একা বোঝা বয়ে বেড়াবে একটা জোয়ালটানা বলদের মতো? এইবার আর কেউ নিক সে ভার, একটু হালকা করে দিক তার দায়িত্ব। শুভো এখন বেশ বড় হয়েছে, লেখাপড়াও শিখেছে। তার চাইতে কম বয়সেই দীনেশ দোকানে গিয়ে বসেছিল, সে আর কতদিন গায়ে ফুঁ দিয়ে বেড়াবে? এইবার সব দেখে-শুনে নিক শুভো, একটু একটু করে পাকা-পোক্ত হয়ে উঠুক। যা থাকবে তা তারি, যা যাবে তা তারি যাবে।

সুতরাং শুভোকে কাজে লাগিয়ে এইবার দীনেশ ছুটি নেবে। পাকাপাকি নয়, হাতে কলমে শেখানোর কাজ যে সবই বাকী রইল। মাঝে মাঝে ছুটি নেবে, মথুরা, বৃন্দাবন, হরিদ্বার—

দীনেশ অবশ্য একটু দ্বিধার মধ্যে আছে এখনো। কথাটার সামান্য মাত্র আভাস দিতেই প্রায় তেড়ে উঠেছিল মন্মথ।

—মানে কী হল কথাটার? ছেলেটার পড়াশুনো বন্ধ করে দিতে চাও নাকি?

—ঠিক তা নয়—দীনেশ থতমত খেয়েছিল : ভাবছিলাম আর পড়েই বা—

—কী হবে, তাই নয়?—শুধু মন্মথের চোখ নয়, তার মুখের মোটা হাভানাটাও যেন ক্রুদ্ধভাবে তাকালো দীনেশের দিকে : সেটুকু বোঝবার বুদ্ধিও লোহাকে খাইয়ে বসে আছো? যাও—যাও—ওসব বদ মতলব ছাড়ো। ঘরে কি তোমার খাওয়ার অভাব হয়েছে যে ছেলেকে এক্ষুনি মালকোঁচা এঁটে রোজগারের ধান্দায় নেমে পড়তে হবে?

—খাওয়ার অভাব নয়, তুমি বুঝতে পারছ না—দীনেশ ক্ষীণভাবে বলতে গিয়েছিল।

যেন হাত বাড়িয়ে মাঝপথে কথাটাকে লুফে নিয়েছিল মন্মথ : আস্পর্দা দেখো লোহাওয়ালার—আমাকে বোঝাতে চায়! হ্যালো বন্ধু, ক্রিমিন্যাল সাইডে আমার প্রচণ্ড প্র্যাক্‌টিস্ আজকাল—হাজারো রকমের মানুষ নিয়ে কারবার করতে হয়। স্রেফ আধ মিনিটে আমি লোকের পেটের কথা আঁচ করতে পারি। ডোণ্ট্ অ্যাক্‌ট অ্যাজ এ বুচার অন্ ইয়োর বয়! শুভোর পড়ার ব্যাপারে যদি কিছুমাত্র বাগড়া দাও, আমি তোমার নামে ক্রিমিন্যাল কেস্ করব—বাল্যবন্ধু বলে ছেড়ে কথা কইব না, রিমেম্বার!

কথাটা হালকা ভাবে থেমে গিয়েছিল, কিন্তু হালকা হয়নি দীনেশের মন। লোক-চরিত্র নখ-দর্পণে বলে গর্ব করেছে মন্মথ, দীনেশও তার প্রতিবাদ করেনি। কিন্তু সত্যি কি মন্মথ বুঝতে পেরেছে তাকে? এতদিন ধরে সকলের জন্যে সে পরিশ্রম করেছে, আজ কেন তার জন্যে কেউ একটুখানি খাটবে না? দীনেশের কি শ্রান্তি-ক্লান্তি নেই—একটা মুহূর্তও কেউ বিশ্রাম নিতে দেবে না তাকে?

শুভোকে ডেকে বলতে হবে একবার। না—জোর খাটিয়ে নয়, ছেলেটাকে

সে দুঃখ দিতে চায় না। একবার বোঝাবার চেষ্টাই করবে শুধু। পড়া তো টাকা রোজগারের জন্যেই? যে সময়টা সে কলেজে বই মুখস্থ করে কাটাবে সে সময়ে ব্যবসার দিকে মন দিলে ঢের বেশি টাকা আনতে পারবে ঘরে—দীনেশ যার ভিত গড়ে দিয়ে গেল, প্রাসাদ তুলতে পারবে তার ওপর। আর নিতান্তই যদি রাজী না হয়—ভারবাহী পশুর মতো একটা ক্লান্ত নিশ্বাস পড়ল তার: সেই-ই টেনে চলবে যতদিন পারে! তবু তাকে একটু ছুটি দিক শুভো—অন্তত দিন কয়েকের ছুটি। এই সামান্য আশাটুকু কি খুব অন্যায় আর অসঙ্গত?

দীনেশ বাড়িতে থাকলে দুপুরে আর গড়ানো হয় না গার্গীর—একটা কিছু কাজ হাতে করে এসে বসে বাইরের বারান্দাটিতে। আজও বসেছিল। সঙ্গে ক্রুশ কাঁটা আর উলের গুটি—একটা নতুন ধরনের পুলওভার বুনছে শুভোর জন্যে।

—মা—এক সঙ্গে দুটো করে সিঁড়ি টপকে ওপরে উঠে এল শুভো।

—কি রে কী হল?

শুভো এসে ঝুপ করে বসে পড়ল মায়ের পাশে। হাতে কিছু চিঠিপত্র।

—আজ আরো দুটো কলেজ থেকে চিঠি এসেছে মা! নানারকম স্টাইপেণ্ডের লোভ দেখিয়েছে। আমি কিন্তু স্কটিশেই ভর্তি হবো।

—কেন, প্রেসিডেন্সি কী দোষ করল?

—ওসব বড়লোকের জায়গা—আমার ভালো লাগবে না।

—তুমি বুঝি গরীবের ছেলে?—গার্গী হাসল।

—ঠিক তা নয়, তবে শুনেছি ওখানে নাকি কিরকম স্নবারি আছে—

—যা খুশি থাক, তোর কী? লোকের উড়ো কথায় কান দিয়ে কি বিশ্বাস করতে আছে? আর তুই পড়াশুনো করতে যাবি—ওসব নিয়ে মাথা ঘামানোই বা কেন? ভালো কলেজ—ভালো পড়ায়—সেটুকুই যথেষ্ট।

শুভো মাথা নাড়ল: সব কলেজেই ভালো পড়ায় মা—নিজের যত্ন থাকলে

কোথাও কিছু আটকায় না। তা ছাড়া স্কটিশেরও তো নাম-ডাক আছে যথেষ্ট। ওখানেই পড়ব আমি।

একটা কথা হঠাৎ যেন মনে পড়ে গেল গার্গীর—মুহূর্তের মধ্যে চমকে উঠল একটা অস্বস্তিভরা সন্দেহ। সুলতা স্কটিশে ভর্তি হবে—তারি জন্মে কি এই আগ্রহটা এসেছে শুভোর মধ্যে? সেদিন শুভোর ঘর থেকে দুটি তরুণ কণ্ঠের মিলিত হাসির শব্দ—খাওয়ার পরে সেই আকস্মিক আলোচনাটা —সব কিছু মিলে একটা নির্দিষ্ট আকার যেন গড়ে উঠতে লাগল। গার্গীর দৃষ্টি একবার শুভোর মুখে গিয়ে পড়ল, কিন্তু সে মুখে কোনো কিছুর স্পষ্ট পাঠোদ্ধার করা গেল না।

হয়তো কিছুই নয়—হয়তো দুটি পরিবারের নিবিড়তম অন্তরঙ্গতা থেকে স্বতঃসিদ্ধ ঘনিষ্ঠতা। একমাসের বড়-ছোট শুভো আর সুলতা—একসঙ্গেই দুজনের মুখে কথা ফুটেছে। এটুকু সহজ মেলামেশা এমনকি আর বাড়াবাড়ি তাদের পক্ষে? এতদিন একথা কল্পনাতেও জাগেনি গার্গীর। কিন্তু হঠাৎ দুজনের চোখের চাউনির মধ্যে ক্ষীণ বিদ্যুতের একটা চমকের মতো যা দেখা গেল—সে কি একান্তই মনের ভুল? যেন অনুভব করা গেল, দুজনের চোখের ভেতর এমন একটা কিছু দেখা দিয়েছে যা অভ্যস্ত পরিচয়ের চেয়ে আরো নিবিড়, আরো অন্তর্মুখী? কেন সুলতার নাম শুনলে হঠাৎ মাথা নামায় শুভো—কেন শুভোকে সামনে দেখলে কিশোরী মেয়েটির সুন্দর গালের ওপর একটা লালের আভা পড়ে?

কে জানে—সবই হয়তো কল্পনা, গার্গীর মনগড়া সৃষ্টি। যে প্রেম তার নিজের জীবনে কখনো এল না—আকাশের সূর্যকিরণে গভীর সমুদ্রের নীলোজ্জ্বল আলো-ছায়ায় ঝিনুকের একটি মুক্তোর মতো যে বিস্ময় কখনো ঝিকমিক করে উঠল না গার্গীর অনুভূতির নেপথ্যে—নিজের বঞ্চিত কল্প-কামনা দিয়ে ওদের মধ্যে সে কি তাই রচনা করতে চাইছে? বাস্তবে তার যে উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি দীনেশ পুড়িয়ে ছাই করে দিয়েছে—ওদের নিয়েই কি রচিত হচ্ছে সেই উপন্যাসের ভাবমূর্তি?

কে জানে—কে জানে। তবু এই বয়েসটাকে উপেক্ষা করা যায় না—তুচ্ছ করা যায় না এই বয়ঃসন্ধিকে। জীবনে না হোক, কবি গার্গী জানে : এই সময়ে হঠাৎ পৃথিবীর রঙ্ বদলে যায়, আকাশের তারায় তারায় সঞ্চারিত হয় একটা নতুন তাৎপর্য—স্তব্ধ রাত্রে অনেক দূর থেকে বাঁশির স্বর ভেসে এলে চোখে ঘুম আসতে চায় না, চিনতে ভুল হয় না বসন্তের বাতাসকে—চিরদিনের চেনা মানুষটির ওপর বিকীর্ণ হয়ে পড়ে অপরিচয়ের ইন্দ্রজাল।—না এই বয়েসটাকে বিশ্বাস নেই। কথাগুলোকে গার্গী যে এই মুহূর্তেই ভাবল, তা নয়। কদিন থেকেই টুকরো টুকরো লঘু মেঘের মতো যা অনুভূতির শূন্যতায় ভাসছিল, তারা যেন হঠাৎ জমাট আর ঘন হয়ে এল। গার্গী আবার শুভোর দিকে তাকালো। তারপর স্পষ্ট সহজ প্রশ্ন করল একটা : স্নলতাও তো স্কটিশে ভর্তি হবে—নয় কি ?

হয়তো এখনি বোঝা যেত ব্যাপারটা ; সচেতন ভাবে হোক—অচেতন ভাবে হোক, এই মুহূর্তেই শুভো উদ্ঘাটিত হয়ে যেত মায়ের কাছে, উন্মুক্ত হয়ে যেত বইয়ের খোলা পাতার মতো। একটা অসহ্য উদগ্র প্রতীক্ষায় দৃষ্টি আরো তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল গার্গীর—মুখের পেশীগুলো শক্ত হয়ে উঠল, দুটো শিরা লাফাতে লাগল কপালের কাছে। কিন্তু সেই চরম মুহূর্ত আসবার আগেই ঘর থেকে দীনেশ ডাকল : শুভো ?

শুভোও কি স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল ? তাই কি অস্বাভাবিক তৎপরতার সঙ্গে জবাব দিয়ে বসল : আজ্ঞে ?

—একবার এসো এখানে। তোমার মাকেও ডাকো।

তৎক্ষণাৎ উঠে গেল শুভো—এক তিলও আর অপেক্ষা করল না। গার্গীকে ডাকবার তার দরকার ছিল না—নিজের কানেই মা শুনেছে।

শুভো ঘরের দিকে পা বাড়ালে গার্গীও উঠে দাঁড়ালো। উল আর ক্রুশ কাঁটা সরিয়ে রেখে কাপড় গুছিয়ে নিলে, ঘোমটাটাকে আরো একটু টেনে নামালো কপালের ওপর, এগোলো ঘরের দিকে।

মোটা কোলবালিশের ওপর কনুই রেখে বিছানা থেকে শরীরটাকে তুলে ধরেছে দীনেশ। চোখে মুখে একটা অসুস্থ অস্বচ্ছতা।

দীনেশ বললে, বোসো। তোমাদের দুজনের সঙ্গেই কথা আছে। বেশ দরকারী।

বাবার বিছানার পাশে বসল শুভো, গার্গী একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসল একটু দূরে। কয়েক মুহূর্ত স্তব্ধতায় কাটল, দীনেশ একবার থুথু ফেলল নিচের পিকদানিতে, তারপর :

নিজের সম্বন্ধে কী ভাবছ শুভো ?—দীনেশ জানতে চাইল।

প্রশ্নটা এমন বিচ্ছিন্ন যে মা আর ছেলে কেউ কোনো জবাব দিতে পারল না। চুপ করে রইল ব্যাখ্যার অপেক্ষায়।

—ম্যাটি্ক তো পাশ করলে, কী করবে এইবার ?—প্রশ্নটাকে এবার রেখান্বিত করল দীনেশ।

—আমি স্কটিশ চার্চ কলেজেই ভর্তি হবো বাবা—একটু আগে মার কাছে যা বলছিল, তারই পুনরুক্তি এল শুভোর কাছ থেকে।

—কলেজের কথা নয়।—দীনেশ একবার কাশল, ঝুঁকে পড়ল পিকদানিতে, যেন সময় নিতে চাইল। তারপর আবার মুখ তুলে বললে, তুমি কি পড়তেই চাও আরো ?

কথাটা দুর্বোধ্য মনে হল শুভোর—তৎক্ষণাৎ জবাব দিতে পারল না। কিন্তু হঠাৎ গার্গীর ভ্রূকুটো জুড়ে এল একসঙ্গে। আজ সতেরো বছর সংসার করে দীনেশকে চিনতে তার বাকী নেই কোথাও। তিক্ত থেকে তিক্ততর অভিজ্ঞতার পুঁজি সঞ্চয় করে গার্গীর মন আজ যেমন সতর্ক, তেমনি সচেতন।

—এ আবার তুমি কী বলছ ? পড়বে না তো কী করবে ?

—হুঁ। তা বটে।—দীনেশ জবাব দিলে। নাক আর কপালের সন্ধিক্ষেত্রে ছোট্ট একটুখানি ভাঁজ ফুটে উঠল তার : কী পড়বে ?

—আমি আর্টস্ই পড়ব বাবা।—নতুনের উত্তেজনায় শুভো প্রগল্ভ হয়ে উঠল : হিস্ট্রি, সিভিক্স্, স্যান্সক্রীট। ফোর্থ সাব্জেক্ট্ নেব লজিক প্রস্পেক্টাস থেকে সব দেখে নিয়েছি।

কথাগুলো গ্রীক ভাষার মতো বাজল দীনেশের কানে। হয়তো একটু

উৎসাহ তার মনকেও স্পর্শ করল—ছোঁয়া লাগল একটি দুর্বল জায়গায়। একটু চুপ করে রইল দীনেশ। কথাটা কোন্‌খান থেকে আরম্ভ করলে বেমানান লাগবে না, সেইটেই যেন স্থির করতে চাইল কিছুক্ষণ।

কিন্তু এ ভাবে দ্বিধা করে সময় নষ্ট করার মানে হয় না। আরো খানিকটা সে উঠে বসল বালিশের ওপর ভর দিয়ে।

—আমার তো মনে হয়, আর না পড়লেও ক্ষতি নেই।

কথাটা বোধ হয় একটু আলোচনার জন্যেই বলেছিল দীনেশ—হয়তো একটু মতামত জানতে চেয়েছিল। হয়তো শেষ পর্যন্ত একটা নিশ্বাস ছেড়ে বলত : পড়তে যখন চাইছ তখন পড়েই যাও। কিন্তু ব্যাপারটা দাঁড়ালো অন্যরকম। সম্পূর্ণ অপ্রস্তুতভাবে একটা বিস্ফোরণ ঘটে গেল ঘরের মধ্যে।

তীর বেগে চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে পড়ল গার্গী।

—বুঝতে পেরেছি তোমার মতলব। ছেলেটার সর্বনাশ করতে চাও তুমি—নষ্ট করে দিতে চাও তার ভবিষ্যৎ!

তুফান উঠল চায়ের পেয়ালায়। মুহূর্তের মধ্যে পারিবারিক আলোচনা চক্রটা রণক্ষেত্রে পরিণত হয়ে গেল।

মনের শান্ত নির্বেদ ভুলে গিয়ে দীনেশ সোজা হয়ে উঠে বসল বিছানায়। প্রখর কণ্ঠে প্রশ্ন করলে, কী বলতে চাও তুমি?

—যা বলতে চাই, সোজা কথাতেই তোমাকে বলছি। তুমি শুভোকে নিয়ে দোকানে বসাতে চাইছ। ও যে লেখাপড়া শিখে মানুষের মতো একটা মানুষ হয়ে ওঠে, তা তুমি চাও না!—গার্গীর ঠোঁট থর থর করে কাঁপতে লাগল।

ধ্বক্‌ করে আগুন জ্বলে গেল দীনেশের চোখে।

—আমার ছেলের কিসে ভালো হবে, সে ভাবনা আমার। ওটা আমার ওপরেই ছেড়ে দাও।

নিজের সমস্ত ব্যর্থ অপমানের জ্বালা যেন বিষের মতো তীব্র হয়ে উঠল গার্গীর রক্তে। মনে পড়ে গেল বিয়ের পরের সেই দিনগুলো—মনে পড়ে গেল

খাতা পোড়ানোর সময় দীনেশের সেই ঘাতক মূর্তি। আহত যন্ত্রণায় গার্গী স্থান-কাল-পাত্র ভুলে গেল, খেয়াল রইল না সামনেই স্তব্ধ হয়ে বসে আছে শুভো।

গার্গী বললে, তোমার ভাবনার ওপর ছেড়ে দিয়ে নিজের চূড়ান্ত সর্বনাশ করেছি আমি। ছেলের সর্বনাশ আর তোমায় করতে দেবো না। আমি ওর মা। ওর সম্বন্ধে আমারও একটা দায়িত্ব আছে!

রাগে কাঁপতে কাঁপতে দীনেশ বললে, না—নেই। এ বাড়িতে আমি ছাড়া আর কারো কোনো দায়িত্ব নেই। তোমাদের কোনো কথাই আমি শুনতে চাইনা। শুভোকে আমি কাল থেকে দোকানে নিয়ে যাব।

—না, পারবে না—গার্গীর এতদিনের ধূমায়িত বিদ্রোহ এবার বিস্ফোরণে আত্মপ্রকাশ করল : আমি কিছুতেই তা হতে দেব না।

দীনেশ বললে, তোমার ইচ্ছা?

—হাঁ, আমার ইচ্ছা।

বজ্রস্বরে দীনেশ বললে, এ আমার বাড়ী। একমাত্র আমার ইচ্ছাই এখানে চলবে।

—তা জানি।—গার্গীর হিংস্র উত্তর এল : জানি। ওই তোমার জোর। এ বাড়িতে যে থাকবে, তুমি তার গলা টিপে মেরে ফেলবে। আমার যা হয়েছে, তা হয়েছে, কিন্তু—

—চুপ করো বলছি—

—না! অনেকদিন চুপ করে থেকেছি, আর নয়। তোমার জোর নিয়ে তুমিই থাকো। কিন্তু আমি মা—আমার ছেলেকে তোমার হাত থেকে আমি বাঁচাব। যদি ছেলের পড়ায় তুমি বাধা দাও, আমি শুভোকে নিয়ে এ বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাব!

—বেরিয়ে যাবে! এতবড় সাহস!—ক্ষিপ্ত ক্রোধে দীনেশ কিছুক্ষণ অসাড় হয়ে রইল। তারপর চিৎকার করে উঠল : তবে তাই যাও—এই মুহূর্তে—এক্ষুণি বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাও—

—তাই যাচ্ছি—গার্গী এগিয়ে এসে শুভোর হাত ধরল : চল্—

শুভো স্থির হয়ে রইল কাঠের পুতুলের মতো।

রক্তক্ষরা চোখে দীনেশ চেঁচাতে লাগল : বেরিয়ে যাও, বেরিয়ে যাও—গেট্ আউট—

—চল্ শুভো।—গার্গী শান্ত হয়ে এল আশ্চর্যভাবে : এভাবে থাকার আর কোনো মানে হয় না। পৃথিবীতে কোথাও না কোথাও একটা জায়গা আমাদের জুটবেই—

শুভো এইবার উঠল। যেন স্বপ্ন দেখছে এইভাবে মার সঙ্গে বেরিয়ে যেতে চাইল ঘর থেকে।

দীনেশ ততক্ষণে বিছানায় দাঁড়িয়ে উঠেছে, মাতালের মতো টলছে তার শরীর। অসংলগ্নভাবে চিৎকার করে চলেছে : বেরিয়ে যাচ্ছ—এতবড় সাহস! তবে তাই যাও! জানব আমার স্ত্রী নেই—ছেলে নেই—দীনেশের গলা অমানুষিক আর্তনাদে ভেঙে পড়ল : আমার কেউ নেই!

পরক্ষণেই হুড়মুড় করে বিছানা থেকে মেঝের ওপর মুখ থুবড়ে পড়ে গেল দীনেশ। তৎক্ষণাৎ বিদ্যুৎবেগে ফিরে এল গার্গী—আর্তনাদ করে ছুটে এল শুভো।

কিন্তু হার্টের ওপর এ চোটটা দীনেশ আর সামলাতে পারল না।

ডাক্তার এসে পৌছোবার কয়েক মিনিটের মধ্যেই দীনেশ মারা গেল। স্তম্ভিত নিঃসাড় মন নিয়ে দীনেশের মুখের কাছে মাথা নামিয়ে গার্গী শুনতে পেল, প্রায় অস্ফুট স্বরে দীনেশ বলে চলেছে : শুভোকে পড়তে দাও—শুভোকে পড়তে দাও—ওর ইচ্ছেয় তোমরা বাধা দিয়ো না।

তের

সাড়ে ছ বছর পরে সিনেট হল থেকে বিব্রত ভাবে বেরিয়ে এল শুভো। ভেতরের ভিড় তখনো ভাঙেনি—সন্থ উপাধি-পাওয়া স্নাতক আর উত্তর-স্নাতকেরা কান পেতে অখণ্ড মন দিয়ে শুনছে বিশিষ্ট অতিথির ভাষণ। আলঙ্কারিক ভাষায়, আবেগতপ্ত স্বরে তিনি শিক্ষার মূল তাৎপর্য বুঝিয়ে চলেছেন, উদ্ধৃতি দিয়ে দিয়ে বলে চলেছেন, শিক্ষার প্রয়োগ ক্ষেত্র কর্মকাণ্ড নয়—জ্ঞানকাণ্ড।

একটি আত্মতৃপ্ত প্রবীণ মানুষের মুখ থেকে সদুপদেশগুলো শুনতে ভালোই লাগছিল। কিন্তু একটা কথা মনে পড়ে হাসি পাচ্ছিল শুভোর। অভাব আর দারিদ্র্যের ভেতরেও অনন্যব্রত হয়ে বিদ্যাচর্চার বাণী যিনি শোনাচ্ছেন—ভারতবর্ষের একজন দুর্ধর্ষ ব্যারিস্টার তিনি! বিনা পয়সায় তাঁর হাত দিয়ে কখনো এক কণা ডাল গলেছে এমন অপবাদ তাঁর অতি বড়ো শত্রুতেও দিতে পারে না। একটা স্বদেশী মামলার জন্যে একবার নাকি তাঁর কাছে গিয়ে প্রার্থনা করা হয়েছিল: এটা দেশের কাজ, তিনি যদি অনুগ্রহ করে—। উত্তরে তিনি বলেছিলেন, ম্যয় তো ভি দেশকা আদ্‌মি হুঁ! কেয়া, দেশকো পেট ভরানেকো লিয়ে ম্যয় ভুখসে মর্ যাউঙ্গা?

একজন নামজাদা প্রিন্সিপ্যালকে মনে পড়ল। কখনো কখনো এমন হতো যে মদে চুর হয়ে নাকি তিনি ক্লাসে আসতেন! তাঁর বক্তব্য ছিল: **Boys, follow my words but not my example.**

এও হয়তো তাই। আমি অধম হলেও আমার উত্তম বাণীটা অনুধাবন করো। 'কুস্থানাদপি'। জলার ধারে মাছের সন্ধানে যে পরম বকটি ওৎ পেতে বসে আছে, তার কাছ থেকে উপদেশ পেয়েও মানুষ পরমহংস হতে পারে।

কিন্তু শুভোর ভালো লাগছিল না। শুধু বক্তৃতাটা নয়—কোথায় যেন

মনের সুর কেটে যাচ্ছে, কিসের একটা অস্বস্তি ভেতরে ভেতরে পীড়ন করছে তাকে। একটু পরেই উস্‌খুস করতে করতে সে সরে এসেছে দরজার কাছে, তারপর সেখান থেকে পা বাড়িয়ে ইউনিভার্সিটির লন পেরিয়ে নেমে এসেছে কলেজ স্ট্রীটে।

শীতের বেলা—এগারোটার কাছাকাছি। সদ্য উথলে-ওঠা গরম খেজুর রসের মতো তপ্ত মধুর রোদ। উজিয়ে-চলা ট্রামগুলোর ভিড় এরই মধ্যে ফাঁকা হতে শুরু করেছে। খানিকক্ষণ ফুটপাথের ওপর চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলো শুভো। বাড়ির গাড়িটা সে আনেনি—হয়তো ট্রামে উঠবে কিনা সেইটেই চিন্তা করল মনে মনে।

টুপিটা আগেই খুলেছিল, এবার গা থেকে খুলে ফেলল কনভোকেশন গাউনটাও। মেডেলের বাক্সগুলো পকেটে পুরে, পার্চমেণ্ট কাগজের ডিপ্লোমাটা হাতের ভেতরে জড়াতে জড়াতে এগিয়ে চলল ট্রাম-স্টপের দিকে।

কিন্তু ট্রামে ওঠা আর হল না, তার আগেই চোখ পড়ল ফুটপাথের ওপারে। কলেজ স্কোয়ারের রেলিঙে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে এতক্ষণ যে শ্রীমতী দীর্ঘদেহা মেয়েটি চীনে বাদামের ঠোঙায় মনোনিবেশ করে ছিল, সেও শুভোকে দেখতে পেয়েছে এইবারে।

মুখের ওপর থেকে বিরক্ত ক্লান্তির ছায়াটা কেটে গেল শুভোর। খুসির ঔৎসুক্যে উজ্জ্বল হয়ে উঠল চোখ। এক ঝলক হাওয়ার মত সে যেন উড়ে গেল সামনের রাস্তাটুকুর ওপর দিয়ে।

—আশ্চর্য যা হোক। সেই কতক্ষণ থেকে তোমায় খুঁজছি আর তুমি এখানে দাঁড়িয়ে চীনে বাদাম খেয়ে চলেছ!

—কী করব? সিনেটের বাইরে দাঁড়িয়ে নাম ধরে ডাকাডাকি করব নাকি তোমার? আধঘণ্টা ধরে এদিক ওদিক পায়চারী করে ভাবলাম, অগত্যা চীনে বাদাম নিয়েই সময় কাটানো যাক। এখন দেখি—কী পেয়েছ।

পকেট থেকে মেডেলগুলো বের করলে শুভো।

—পাঁচটা? বাঃ—কী চমৎকার!—মেয়েটির মুখ ঝলমল করে উঠল:

এইটে বুঝি ইউনিভার্সিটি গোল্ড মেডাল? কী সুন্দর দেখতে!—রোদের আলোয় মেয়েটির দীপ্ত মুখের মতোই চিকচিক করে উঠল সোনার মেডালটা।

—সুন্দর নয়, অত্যন্ত ক্রুড-ক্র্যাফ্‌টের নমুনা। তবু এটা যদি তোমার এতই পছন্দ হয়, তবে বীর হস্তে বরমাল্যের সঙ্গে না হয় তোমার গলাতেই লকেট করে ঝুলিয়ে দেব সুলতা।—শুভো হেসে উঠল।

সুলতার মুখ রাঙা হয়ে উঠলো।

—কী ইয়ারকী হচ্ছে রাস্তার ভেতরে? চলো—চলো। গাড়ী নেই সঙ্গে?

—না।

—তবে ট্রামে ওঠা যাক।

—না, তাও নয়।

—তা হলে কি হেঁটে যাবে নাকি এতটা রাস্তা? এই কলেজ স্কোয়ার থেকে শ্যামবাজার পর্যন্ত?

শুভো বললে, তাই তো ভাবছি।

—হঠাৎ দুপুর বেলা এরকম হাঁটবার সখ হল যে?

—সখ নয়—শুভো আবার হাসল: উপাধি পাবার পরে বিদ্যার্থীকে নতশিরে, নম্রচিত্তে এবং দীনভাবে গৃহে ফিরে যেতে হয়। এইটেই নিয়ম। কী, হাঁটতে আপত্তি আছে?

সুলতা বললে, না। কিন্তু তা হলেও এখান থেকে শ্যামবাজার—

—শ্যামবাজারই তো। দিব্যি সোজা রাস্তার পাশে চওড়া ফুটপাথ। এই রাস্তায় এইটুকু হাঁটতেই দ্বিধা হচ্ছে, অথচ তুমি পলিটিক্সের দুর্গম-গিরি-কান্তার মরু পার হয়ে যেতে চাও?

সুলতা ভ্রূভঙ্গি করলে: যেতে হয়, চলো। রাস্তায় দাঁড়িয়ে তোমার সঙ্গে ঝগড়া করবার কোনো মানেই হয় না।

দুজনে হাঁটতে আরম্ভ করলে। শুভো বললে, সত্যি, ভারী ইচ্ছে করছে দুজনে পাশাপাশি অনেক—অনেকক্ষণ ধরে হাঁটতে থাকি। ট্রামে চাপলে তো পথটা এখুনি ফুরিয়ে যাবে, কাছে পেতে না পেতেই দূরে সরে যাবে তুমি।

গভীর শান্ত চোখে শুভোর দিকে তাকালো স্থলতা।

—ফ্ল্যাটারিটা তোমার মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছে শুভো। তোমার সঙ্গে আমার পরিচয় আজ একুশ বছরের।

—আর এই একুশ বছর ধরে প্রতিদিন তোমাকে আমি নতুন করে আবিষ্কার করেছি—তা কি তুমি জানো? আমার মনে হয় সু, তুমি যেন একখানা অফুরন্ত গীতিকাব্য। প্রত্যেক দিন একটি করে নতুন পাতা খুলি, একটি করে নতুন বিস্ময় আমায় রোমাঞ্চিত করে তোলে।

স্থলতা বিব্রত হয়ে বললে, আঃ, থামো না, এটা যে কর্পোরেশনের সদর রাস্তা সেটাও ভুলে যাচ্ছ?

শুভো বললে, সদর রাস্তা বলেই তো স্থবিধে। ঘরের কোণে, লেকের পাড়ে, গঙ্গার ধারে নিরিবিলিতে কিছু বলতে গেলেই লোকের চোখ পড়ে। কিন্তু পথ-চল্‌তি মানুষ নিজেকে নিয়ে এত বিব্রত থাকে যে আর কারো দিকে তাকানোর সময় পায় না।

স্থলতা হাসল: তাই কি! কাব্য আওড়াচ্ছ বলেই চারদিকের দৃষ্টি-বাণগুলো উপলব্ধি করছ না। কিন্তু আমি হাড়ে হাড়েই টের পাচ্ছি।

—আহা, অত অল্পেই অফেন্‌স নিলে চলবে কেন? পথ দিয়ে একটি মেয়ে চলেছ—দেখতে শুনতেও নেহাৎ মন্দ নয়—একটুখানি চোখ মেলেও দেখবে না লোকে?

—হ্যাংলামি।

—এদিকে রাজনীতি করছ, ওদিকে এইটুকুতেই গায়ে লাগছে? যদি রাগ না করো, একটা সত্যি কথা বলি সু। একটা ছোট্ট সাইকোলজিক্যাল গল্পের প্লট দিচ্ছি তোমাকে। স্থন্দরী একটি মেয়ে একা কলকাতার পথ দিয়ে মাইল খানেক হেঁটে এল—অথচ একজন লোকও একবার তার দিকে ফিরে তাকালো না—ভাবতে পারো, কী নিদারুণ ট্র্যাজেডী সেটা! তার মানেই তার নারীত্বের একেবারে প্রাথমিক দাবীটা অস্বীকৃত হল পৃথিবীর কাছে। এর পরে সেই মেয়েটি বাড়ি ফিরে যদি পটাশিয়াম

সায়ানাইড্ খোঁজে, তা হলে গল্পের লেখককে তুমি দোষ দিতে পারো না।

—আজ হল কী তোমার? কবিতা, গল্প—যেন একেবারে শূন্যের ওপর ভর দিয়ে চলেছো!

—মনটা আজ ভারমুক্ত হয়ে গেছে সু। তোমাকে সঙ্গে করে নিয়ে চলেছি কেন, জানো?

—বলো।

—দুজনে মিলে যার কাছে প্রার্থনা পেশ করতে যাব আজ।

থমকে দাঁড়ালো সুলতা। চারুদর্শনা মেয়েটির শান্ত গর্বিত মুখের ওপর দিয়ে ছায়া ঘনিয়ে এল।

—কী হল, দাঁড়ালে যে?

—ভাবছি, আর না এগোনোই ভালো।

গাম্ভীর্যে ঘন হয়ে এল শুভোর তরল দৃষ্টি। চোখের তারা দুটো কাঁপতে লাগল অল্প অল্প। তারপর:

চলো ট্রামেই উঠি সুলতা।—ইচ্ছে করেও শুভো এবারে সু বলতে পারল না, একটা অনিরীক্ষ্য ব্যবধান দুজনের মাঝখানে স্তব্ধ-পুঞ্জিত হয়ে উঠতে লাগল।

—না।—নিশ্চিত মৃদু জবাব এল সুলতার।

—সুলতা!

সুলতা বললে, যেটা নিশ্চিত বলে জানো, অথচ যার ওপর এখনো একটু আবরণ আছে বলে আত্মপ্রবঞ্চনা করা চলে—সেটাকে কেন আঘাত দিয়ে নগ্ন করে ফেলতে চাও? তারপরে তোমার সঙ্গে আর আমার দেখা হওয়াও সম্ভব হবে না—এই সত্যি কথাটা কি বুঝতে পারছ না?

কথা বলার আগে বার কয়েক নড়ে উঠল শুভোর ঠোঁট দুটো।

—এতটা এগিয়ে ভাববার সময় কি এখনি এসেছে?

—এগিয়ে ভাববার কিছু নেই শুভো। জেঠিমাকে আমার চেয়ে তুমি কিছু কম জানো না।

শুভোর চোখের তারা দুটো আবার কাঁপতে লাগল অল্প অল্প।

—কিন্তু মা আমাকে ভালোবাসেন......

...গার্গীও সেই কথাই বললেন নিজেকে: আমি শুধু শুভোর জন্যেই সেদিন বাঁচতে পেরেছিলাম। এই বাড়ির অন্ধকার কোণাগুলো, ভারী ভারী ফার্ণিচারের স্তম্ভিত শীতল ছায়া, ঘরের বড় ঘড়িটার ঘড়ঘড়ে আওয়াজ—সব মিশে মনে হয়েছিল নিশ্বাস নেবার মতো একটুখানি হাওয়াও কোথাও খুঁজে পাচ্ছি না। বন্ধ হলঘরটার কোণায় কোণায় যেখানে মাকড়শার জালের মধ্যে এক-একটা পোকা মৃত্যু-যন্ত্রণায় ছটফট করছে, আমার মনে হয়েছিল অমনি একটা জাল চারিদিক থেকে আমাকে ঘিরে ধরছে, আমিও—

: আমিও—বারান্দায় দাঁড়িয়ে ভাবলেন গার্গী, ভাবলেন উঠোনের ওপর ঝরে-পড়া মুঠো মুঠো রোদের দিকে তাকিয়ে। এখানেও সেই রোদ—সেই কলেজ স্ট্রীটের তপ্ত-মধুর উত্তাপ—প্রথমে উতলে-ওঠা খেজুর রসের মতো যার আস্বাদ। সেই রোদের সঙ্গে সঙ্গে কলেজ স্ট্রীটের মনের তরঙ্গ এসেও ভেঙে পড়তে লাগল গার্গীর চেতনার ঘাটে ঘাটে।

: কিন্তু আমি বাঁচলাম। শুভো নিয়ে এল রৌদ্রকে, নিয়ে এল আকাশকে, জানলা দিয়ে দেখা শিকল বাঁধা লোহার বয়াটার গায়ে জোয়ারের আঘাত লাগল এসে। শিকল ছিঁড়ল না, কিন্তু আনল সমুদ্রের সংবাদ। সেই সমুদ্রেরই সংকেত আমি দিনের পর দিন খুঁজেছি শুভোর মুখে। কাশীর গঙ্গায় ফিরে যাওয়ার পথ নেই, কিন্তু সমুদ্র?

: শুভোকে পড়তে দাও, শুভোর ইচ্ছেয় বাধা দিও না।—মৃত্যুর সময় বলে গিয়েছিলেন স্বামী। আঘাত দিয়েছিলাম আমি—সব চেয়ে নিষ্ঠুর আঘাত, হয়তো অতখানি ওঁর পাওনা ছিল না। হয়তো অবিচার করেছি ওঁর ওপর—আমি না হয়ে আর কেউ জীবনে এলে ওঁর ক্ষোভ থাকত না, থাকত না অপূর্ণতা—নিজের মাঝখানে উনি সুখী থাকতে পারতেন। যা চেয়েছিলেন, তাই পেতেন—একটা নিরাপদ বৃত্তের আশ্রয়ে থেকে প্রত্যেকটি দিনকে কাটিয়ে যেতেন নির্ভুল হিসাবের ধারাবাহিকতায়।

: আমিই ওঁর মৃত্যু ঘটিয়েছি। তবু ক্ষমা করেছেন। আমাকে—শুভোকে। সে ক্ষমার আশীর্বাদ তো ব্যর্থ হয়নি। কৃতী হয়েছে শুভো, টক টক করে পার হয়ে গেছে বিশ্ববিদ্যালয়ের এক একটা ধাপ—এম, এ পরীক্ষায় সোনার মেডেল পেয়েছে সে। বেঁচে থাকলে কত খুশি হতেন আজ—লোহার কারবারে এক লক্ষ টাকা লাভ হওয়ার চাইতেও ঢের বেশি লাভ মনে করতেন আজকের দিনটিকে—

: কন্‌ভোকেশনে গেছে শুভো। কিন্তু ফিরছে না কেন এখনো? বলেছিল, তাড়াতাড়ি আসবে। কে জানে, অনেক বক্তৃতা হচ্ছে বোধ হয়। নাকি, পথে সুলতা—

উঠোনের রোদের ওপর মেঘের ছায়া নামল।

...হঠাৎ রোদ-নিভে-যাওয়া ছায়াটার দিকে তাকালো সুলতা। নামিয়ে রাখল চায়ের পেয়ালা।

—কিছু মনে করো না, আর ভালো লাগছে না চা খেতে।

—আজকের সকালটা যখন শুরু হয়েছিল, তখন ভালো-না-লাগার এই মুহূর্তটা এমন করে যে এসে পড়বে সে কথা মনে হয় নি—গভীর গলায় শুভো জবাব দিলে :

তা ছাড়া এ আলোচনা আমার জীবন-মরণের প্রশ্ন।

সুলতা যান্ত্রিক হাসি হাসল : কথা দুটো অত্যন্ত ভারী। জীবন-মরণ ব্যাপারটাকে যত সহজে তুমি আউড়ে যাচ্ছ, আসলে তা অত সোজা নয়। এক একটা 'মুডে' মৃত্যুর ভাবনাটা আমাদের কল্পনার রসদ জোগায়—মনটাকে রোমাঞ্চিত করে তোলে। কিন্তু মুডটা ক্ষণ-বুদ্‌বুদ—বেশিক্ষণ দাগ রাখে না। আর জীবন? ওটা বাঁকে বাঁকে চলে—একটা বাঁককে পেরিয়ে গেলে আর একটাকে আর পিছে তাকিয়ে চোখে পড়ে না। তুমি ভেবো না—এমনি ভাবে আমিও একটা বাঁকের আড়ালেই হারিয়ে যাব।

শুভো উত্তেজিত হয়ে উঠল : তোমার এ দার্শনিক ব্যাখ্যা আমি মানি না। তাছাড়া কথার ওপরে শুধু কথার জাল বুনেই বা কী লাভ? পাশ

কাটিয়ে যাওয়ার চাইতে মুখোমুখি এসে দাঁড়ানোটাই আমি উচিত বলে মনে করি।

—বেশ, তাই করো।—ছায়াঢাকা পথের দিকে সুলতা তেমনি চোখ মেলেই রাখল : কিন্তু যা ঘটবে তা আমি জানি। জেঠিমা রাজী হবেন না।

—কেন ?

—আমি রাজনীতি করি। বি-এ পাশ করার পর থেকে এখানে-ওখানে বক্তৃতা দিয়ে বেড়াই। তাছাড়া একটা অত্যন্ত সোজা জিনিস রয়েছে। আমাদের জাত আলাদা !

—জাত কে মানে ?—শুভো অস্বস্তিভরে আঁচড়াতে লাগল টেবিলটাকে : আর আমাদের রক্ষণশীল পরিবারে মা-ই প্রথম বিদ্রোহী। এ বাড়ীতে তিনিই প্রগতিকে ডেকে এনেছিলেন—আমার শিক্ষার পথটাকে খুলে দিয়েছিলেন।

একটু ভুল করছ শুভো। একটা যুগে প্রগতির যে সীমারেখা, পরের যুগে সেইটেই স্টার্টিং পয়েন্ট। সে সীমায় এসে যে দাঁড়িয়ে পড়েছে, তাকে ছাড়িয়ে-চলাদের সে কখনো ক্ষমার চোখে দেখে না।

—অন্যায় রকম জেনারেলাইজেশন হচ্ছে সুলতা। ব্যতিক্রম আছে।

—আছে বলেই তো প্রমাণ হয় সেটা। আর আমি যতদূর জানি, সে ব্যতিক্রমের দলে জেঠিমা পড়েন না। তাই বলছিলাম, আবরণটা যতক্ষণ আছে থাকুক—ততক্ষণ ভোলানো যাক নিজেদের। তারপর যখন সময় আসবে, ময়ূর-মার্কা মোটরে চড়ে চেলি পরে যখন সালঙ্কারা একটি নববধূকে ঘরে আনবে, তখন আমায় খবর দিতে ভুলো না। আমি যথাসময়ে গিয়ে পেট ভরে লুচি-কোর্মা-সন্দেশ খেয়ে আসব !

শুভোর সমস্ত মুখ লাল হয়ে উঠল।

—আমার ব্যক্তিত্বকে তুমি বিশ্বাস করো না ? মনে করো না—নিজের ভেতরে কিছুমাত্র শক্তি আছে আমার ?

—সে শক্তিকে তুমি কি তলোয়ার করে মা-কে আঘাত দিতে চাও ?

সবচেয়ে বড় ত্যাগ দিনের পর দিন যিনি তোমার জন্তে স্বীকার করে এসেছেন, তাঁর ওপর নামাতে চাও পরশুরামের কুঠার?

শুভো স্তব্ধ হয়ে রইল। যেন মুখের ওপর চাবুক মেরেছে সুলতা। পরশুরামের কুঠারই বটে।

—তা হয় না শুভো।—সুলতা উঠে দাঁড়ালো: কিন্তু এ সব আলোচনা এখন বন্ধ করো। মেডেল পেয়েছ, ডিপ্লোমা পেয়েছ—পথে আর এমন করে দেরী করাটা ঠিক হচ্ছে না। এবারে বাড়িতে গিয়ে মা-কে তোমার প্রণাম করা উচিত।

বেয়ারা চায়ের বিল এনেছিল। অগ্নিগর্ভ পর্বতের মতো একটা টাকা তার দিকে ছুঁড়ে দিলে শুভো। তারপর বাকী পয়সাটা ফিরে নেবার কথা ভুলে গিয়েই তীব্র বেগে দাঁড়িয়ে পড়ল।

—চলো।

চৌদ্দ

সুরমা ঘরে ঢুকে বললেন, তুমি কি কিছুই দেখবে না?

ব্রীফের মধ্যে তালিয়ে থাকা মন্মথ আবিষ্ট চোখ তুললেন। সুরমার দিকে তাকিয়ে বললেন, হুঁ, ঠিক ধরেছ। বম্বে হাইকোর্ট, নাইনটিন্ থার্টি ওয়ান। তায়েবজী ভার্সাস আলুওয়ালা।

—কী আলু-পটোলের হিসেব করছ বসে বসে? ওর জন্তে এক গণ্ডা চাকর রয়েছে বাড়িতে।—বিরক্ত হয়ে উঠলেন সুরমা: তোমাকে কি কিছুই বলা যাবে না?

মন্মথর ঘোর ভাঙল। স্ত্রীর রুষ্ট মুখের দিকে তাকালেন প্রসন্ন হাসিতে।

—বলা যাবে না কেন? তবে আমি অ্যাডভোকেট—জানো তো? কন্‌সালটেশন্‌স্ চার্জড্ উইথ্—

সুরমা বললেন, তবে যাই। তোমার কন্‌সালটেশন্ ফী-টা নিয়েই আসি আগে।

সত্যি সত্যিই যাওয়ার জন্যে পা বাড়ালেন তিনি।

—আরে, শোনো—শোনো!—বিব্রত হয়ে মন্মথ ডাকলেন: আজকেও বুঝি নতুন চাকরটা আর একটা ফুলদানি ভেঙেছে? বেশ তো, এবার তুমি ওর মাইনে থেকে স্বচ্ছন্দে দাম কেটে নিতে পারো, আমি আর প্রতিবাদ করব না।

সুরমা বললেন, কী আশ্চর্য! আগ বাড়িয়ে এসব তোমাকে বলতে বলেছে কে?

—তবে ফুলদানি নয়? আরও সিরিয়াস? লাল মাছের কাচের জার?

হতাশ হয়ে সুরমা একটা চেয়ারে বসে পড়লেন: বলে যাও।

—উঁহু, এবার তাহলে শুনতে হল।—মন্মথ নড়েচড়ে সোজা হয়ে উঠলেন: এখন তুমি সওয়াল শুরু করতে পারো।

—বুড়ো হয়েছ, তবু ছেলেমানুষি গেল না? সুরমার স্বরে ধিক্কার: এই করেই মেয়েটাকে গোল্লায় দিলে!

—কেন, জেলে-টেলে গেছে নাকি? মন্মথর চোখে-মুখে আশঙ্কার এক টুকরো ছায়া পড়ল।

—এখনো যায়নি, তবে শিগগিরই যাবে।—ক্লান্ত গলায় সুরমা বললেন: চোখের সামনে একটা মাত্র মেয়ে এমন ভাবে নষ্ট হয়ে গেল, তুমি একটু বাধা পর্যন্ত দিলে না?

এক ফালি বিষণ্ণ হাসি হাসলেন মন্মথ।

—বাধা দিইনি বলেই এখনো জেলে যাওয়ার মতো অতটা উগ্র হয়ে ওঠেনি। বাধা দিলে আগেই যেতো। দেখতে পাচ্ছ না যুগটাকে? একটা হার্ড্‌ল রেসের নেশা ছড়িয়ে পড়েছে আকাশে-বাতাসে। বাধা যেখানে যত বেশি, একালের ছেলেমেয়েরা সেখানটাকেই আগে টপকে পার হতে চায়।

—কিছুই করবে না তবে?

—কী করব ?—শূন্যে চুরুটের ধোঁয়া ছাড়বার মতোই কথাটাকে ছেড়ে দিলেন মন্মথ : চরম কিছু না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষাই করি।

—একটা উপায় তো এখনো আছে। বিয়ে দিয়ে দাও না! বয়েস তো কম হল না মেয়ের!—সুরমা তিক্ত হয়ে উঠলেন।

—হার্ড্‌ল্ রেসের সব চেয়ে উঁচু বেড়াই যে ওইটে!

লাল কালির মোটা ফাউন্টেন পেনটাকে হাতের ওপর নাচাতে লাগলেন মন্মথ : যদি বলি বিয়ে করো, সঙ্গে সঙ্গেই বলবে : এখনো সময় হয়নি। যদি বলি, বিয়ে কোরো না, তা হলে তৎক্ষণাৎ দৌড়োবে রেজিস্ট্রেশন অফিসে।

—তা হলে শেষটাই বলো না মেয়েকে।

—উঁহু, উকিলের মেয়ে। চালাকি ধরে ফেলবে। তক্ষুণি পায়ের ধুলো নিয়ে বলবে, আহা বাবা, কী লক্ষ্মী ছেলে তুমি!

মেঘ-গম্ভীর মুখে কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন সুরমা।

কথাটা হাল্‌কা চালে চলেছে বটে, কিন্তু এর নেপথ্যে যে একটা গভীর বেদনার অন্তঃশীলা বইছে—দুজনেই স্পষ্ট অনুভব করছিলেন সেটাকে। তাছাড়া আরো একটা কথা একসঙ্গেই মনে এসেছিল দুজনের। কিন্তু কেউই বলতে পারছিলেন না কথাটা। একটা সংশয়—একটা ভার। কে যে আগে বলবেন সেইটেই যেন স্থির করতে পারছিলেন না তাঁরা।

মন্মথ হাতের কলমটার ক্যাপ খুলে অত্যন্ত মন দিয়ে নিব পরীক্ষা করতে লাগলেন, দেওয়ালের একটা বিলিতি ক্যালেণ্ডারের দিকে কুঞ্চিত ভ্রূতে চেয়ে রইলেন সুরমা। রাস্তার ওপারের একটা বাড়ি থেকে পিয়ানোর টুং টুং আওয়াজ আসছে—মন্মথর পায়ের কটকী জুতোটা অন্যমনস্ক ভাবে মৃদুমন্দ তাল দিয়ে চলল তার সঙ্গে।

অস্বস্তিকর একঘেয়েমিটার ওপর যতিপাত করল টেলিফোনের গুঞ্জন। হাত বাড়িয়ে রিসিভার তুলে নিলেন মন্মথ।

—ইয়েস—ওঃ, শুভো? ইয়েস, আই নো মাই বয়—ইয়েস আই অ্যাম ভেরী গ্ল্যাড! হাঁ হাঁ, যাব বইকি, নিশ্চয়ই যাব। এর জন্যে কি আর

ফর্মালিটির দরকার আছে কিছু? না, সুলতা এখনো ফেরেনি। অ্যাঁ, তুমি আসছ? কথা আছে? বেশ তো। না, আজ আমি আর কোর্টে যাব না। বিশেষ কাজ না থাকলে আজকাল আর বেরোই না—জানোই তো। আচ্ছা, সো লং।

রিসিভার নামিয়ে অন্তর্মুখী আর উৎকণ্ঠিত চোখে মন্মথ তাকালেন।

—শুভো টেলিফোন করছিল।

সোজা হয়ে বসলেন সুরমা। তাঁরও মুখের ওপর লঘু ছায়া ঘনিয়ে এসেছে।

—সে তো শুনলামই। কিন্তু কী বলতে চায়?

—কাল সন্ধ্যায় ওদের বাড়িতে খাবার নিমন্ত্রণ। ওর মা বিশেষ করে বলে দিয়েছেন। তা ছাড়া—

—তা ছাড়া? সুরমার দৃষ্টি আরো সজাগ, আরো জিজ্ঞাসু হয়ে উঠল।

—ঘণ্টাখানেক পরে শুভো আমাদের বাড়িতে আসতে চায়। কী যেন ওর বলবার আছে। টেলিফোনে নাকি হয়ে উঠবে না সেটা—একটু পার্সোন্যাল।

একটা সুরের আমেজ দিয়ে পার্সোন্যাল কথাটা ছেড়ে দিলেন মন্মথ—ডান চোখের কোণাটা কুঁচকে গেল একবার। কিন্তু এতক্ষণ অপেক্ষা ক'রে ক'রে অধৈর্য হয়ে উঠেছিলেন সুরমা। দিনের পর দিন টের পাচ্ছিলেন, যা সত্য তা ক্রমে সত্যতর হয়ে উঠছে, যা ইঙ্গিত—এখন তা প্রায় নিজেকে অসংকোচে মেলে ধরেছে। আর দেরি করা চলে না—কোনোমতেই না।

বলতে কী, আজ সোজাসুজিভাবেই তিনি প্রশ্নটাকে তুলে ধরতে চেয়েছিলেন মন্মথর কাছে। কিন্তু ভূমিকা শুরু করেই লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে পড়েছিলেন, ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন কথার পাকে পাকে। দু'জন বিচক্ষণ তলোয়ার-যোদ্ধার মতো তাঁরা যেন পরস্পরকে পরীক্ষা করছিলেন এতক্ষণ—কে আগে আঘাত করবেন, সেইটেই ঠিক হচ্ছিল না কিছুতে।

কিন্তু শুভোর টেলিফোন—একটা ব্যক্তিগত আলাপ আলোচনার ইঙ্গিত—

সুরমা সংযমের সীমা হারালেন। হাতের তলোয়ার এইবারে সোজা গিয়ে পড়ল মন্মথর ওপর।

—পার্সোন্যাল কথাটা কী হতে পারে, সে কি তুমি আন্দাজ করতে পারো না?

—হয়তো পারি, হয়তো পারি না। তবু শুভো না আসা পর্যন্ত আমি অপেক্ষাই করতে চাই।

—তোমার ওকালতি প্যাঁচ রেখে দাও এখন—সুরমা ধৈর্য হারালেন: শুভো কী বলতে চায় আমি জানি।—মন্মথকে প্রস্তুত হওয়ার অবকাশ না দিয়েই একটানে বলে গেলেন: ও আজ সুলতার সম্বন্ধে খোলাখুলিই কথা কইবে।

—সুলতার সম্বন্ধে?

—আকাশ থেকে পড়লে যে!—আরো স্পষ্টভাষিণী হয়ে উঠলেন সুরমা: তোমার মেয়ে। একই বছরে কয়েক মাসের পিঠেপিঠি জন্মেছে দুজনে, পড়েছে একসঙ্গে, একসঙ্গে বড় হয়েছে।

মন্মথ এখনো নিজেকে ধরা দিলেন না: এটা পুরোনো খবর—বিশেষ ভাবে কিছু শোনবার নেই এতে।

—আরো একটা পুরানো খবরও তোমাকে দিতে চাই। খবর পুরোনো হলেও সমস্যাটা নতুন।—সুরমা মন্মথের দিকে ঝুঁকে পড়লেন: আজ যদি শুভো এমন প্রস্তাব তোলে যে বাকী জীবনটাও দু-জনে একসঙ্গে কাটাতে চায়—উৎকণ্ঠিতা গৃহিণীর গালেও লালের ছোপ লাগল: তা হলে কী তার জবাব দেবে সেটা ভেবে রেখেছ?

মন্মথ চমকালেন না—মুখের একটা পেশীও কাঁপল না তাঁর। আস্তে আস্তে লাল কালির কলমটাকে আবার হাতে তুলে নিলেন। সওয়াল করার সময় যে-ভাবে অভ্যাস মতো আঙুলটা বাড়িয়ে দেন, সেই ভাবেই কলমটাকে বাড়িয়ে ধরলেন সুরমার দিকে।

—এ সম্ভাবনার কথা অনেকদিন আগে থেকেই আমি জানি। জবাবও তৈরি রেখেছি তার জন্যে।

—কী তোমার জবাব ?—অল্প অল্প গলা কাঁপতে লাগল সুরমার।

—আমি মত দেব না।

—মত দেবে না ?

—না।

বিবর্ণ হয়ে গেল সুরমার মুখ—মুহূর্তের মধ্যে গালে-কপালে ফুটে উঠল কয়েকটা ক্লান্ত রেখা : আপত্তি কোথায় তোমার ? তুমি কি জাতের বাইরে যেতে চাও না ?

—ডোণ্ট্ বি সিলি !—অনেকক্ষণের অনিশ্চয়তার পর এই বারে মন্মথ যেন একটা নিশ্চিন্ততার ভিত্তি পেয়েছেন খুঁজে—এতক্ষণ ধরে এড়িয়ে চলা জিনিসটাকে বিচক্ষণ আইনজীবীর আত্মপ্রত্যয়ে আঁকড়ে ধরেছেন মুঠোর মধ্যে : প্লীজ, ডোণ্ট্ বি সিলি ! মনের কুলশীল মিলিয়ে আমার মেয়ে যাকে গ্রহণ করতে পারে, তার বাইরের সামাজিক পরিচয় আমার কাছে অনাবশ্যক। ও নিয়ে মাথা ঘামিয়ে আমার সময় নষ্ট করতে চাইনে। অভিভাবক হিসেবে আমি শুধু দেখব, নিজের পায়ে দাঁড়াবার মতো তার যথেষ্ট জোর আছে কিনা, মানুষ হিসেবে সে ভদ্রসমাজে চলবার যোগ্য কিনা এবং আমার মেয়ে ভুল করে একটা অপাত্রের হাতে নিজেকে সঁপে দিয়ে জীবন নিয়ে জুয়ো খেলছে কিনা। যদি এসব ব্যাপারে আমার কিছু বলবার না থাকে, দেন্ এভ্রিথিং ইজ অল্‌রাইট।

—শুভোর ক্ষেত্রে এর একটা প্রশ্নও ওঠে না—সুরমা আত্মস্থ হতে চাইলেন।

মন্মথ বললেন, ভুলে যাচ্ছ কেন, দীনেশ আমার সব চেয়ে বড় বন্ধু ছিল। তার সংসারে কিছু ভালোমন্দ ঘটলে সে দুর্ভাগ্য আমারও। তার পরিবারে আমিই যদি কোনো দুঃখের কারণ সৃষ্টি করে বসি, তা হলে সে লজ্জা রাখবারও আমার জায়গা থাকবে না।

—শুভোর মার খুব কি অমত হবে ?

মন্মথ বিমর্ষ হাসি হাসলেন : অমত কম-বেশি হওয়ার কোনো কথাই নেই। তিনি রাজি হবেন না।

—জাত আলাদা বলে ?

—ঠিক তাই।

সুরমার মুখ ক্রমশ শক্ত হয়ে উঠতে লাগল : কিন্তু দিদি সুলতাকে মেয়ের মতোই ভালোবাসেন।

—সেইটুকু পর্যন্ত থেমে থাকাই ভালো। কিন্তু পুত্রবধূ করবার কথা তুললেই সব কিছুর সুর কেটে যাবে সুরমা। এতদিন ধরে তাঁদের সঙ্গে যে আত্মীয়তার সম্বন্ধটুকু রেখে এসেছো, চিরদিনের মতো ছেদ পড়ে যাবে তার ওপরে।

সুরমা উত্তেজিত হয়ে উঠলেন।

—কী এত জাতের বড়াই ? ভারী তো বামনাইগিরি ! আমার মেয়ে ঘরে গেলে বর্তে যাবে ওরা। রূপে-গুণে এমন মেয়ে কটা আছে চারদিকে—শুনি ?

আবার সেই বিষণ্ণ হাসি হাসলেন মন্মথ : জাতের তর্কটা অবান্তর সুরমা। ওটা লজিকের মধ্যে নেই—অভ্যাসের গণ্ডিতে গিয়ে পৌঁছেছে। সে অভ্যাস যখন এত শিক্ষা-দীক্ষাতেও ছাড়ল না, তখন তোমার কথাতেও ছাড়বে না। তা ছাড়া তোমার মেয়ের সম্পর্কে তোমার সার্টিফিকেটও আদালতে প্রামাণ্য নয়।

—চুলোয় যাক আদালত !—সুরমা জ্বলে উঠলেন : আমি তোমায় বলছি, দিদির মত আমি করাবই।

—পারবে না।

—পারতেই হবে। চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছ না ওরা দু'জনের জন্যেই তৈরী হয়েছে ? ওদের আমি কিছুতেই আলাদা করে ছিঁড়ে নিতে পারব না। আর তাছাড়া তুমি যতটা আগ বাড়িয়ে ভাবছ, তা নাও তো হতে পারে। হয়তো দিদি কত খুশি হবেন—এক কথাতেই রাজী হয়ে যাবেন।

বিখ্যাত অ্যাডভোকেট—বিজ্ঞ সংসারী মানুষ মন্মথ আর জবাব দিলেন না। নিঃশব্দে হাসলেন মৃদু করুণার হাসি। টেবিল থেকে তুলে নিলেন মোটা হাভানা—জ্বালাতে গেলেন দেশলাই।

কিন্তু সেই মুহূর্তেই দেশলাইটা তাঁর হাত থেকে টপ করে পড়ে গেল

টেবিলের ওপর। যেন নিজের অজ্ঞাতেই নামিয়ে ফেললেন চুরুটটা। বাড়ির বাইরে একটা গাড়ি এসে থেমেছে। ওই গাড়ির আওয়াজটা মন্মথর চেনা।

মন্মথ বললেন, শুভো এসেছে।

সুরমার মুখের ওপর দিয়ে আশঙ্কার চমক খেলে গেল একটা। আশ্চর্য, বাইরের গেট খুলে এগিয়ে আসা জুতোর শব্দটা কান পেতে শুনতে শুনতে তিনি ভাবতে লাগলেন : আজ এই মুহূর্তে অন্তত শুভো না এলেই যেন ভালো করত।

গার্গী বললেন, একি ! তুই কখন এলি ?

সুলতা হাসছিল। বললে, এই অসময়ে বসে বসে ঘুমুচ্ছেন জ্যেঠিমা ?

গার্গী লজ্জা পেলেন : বয়েস হয়েছে—শরীরও মোটা হয়ে গেছে। দিনরাত ধরে শুয়ে বসে ভারী আয়েসী হয়ে গেছি আজকাল। শুভোর জন্যে পুল্‌-ওভারটা বুনতে বসেছিলাম, কখন যে ঘুম এসে গেছে, টের পাইনি।

গার্গীর ডেক চেয়ারের পাশে একটা টুল টেনে নিয়ে বসল সুলতা। কাঁধ থেকে পাশে নামিয়ে রাখল রঙীন কাপড়ের ঝোলাটাকে—একরাশ বই আর কাগজপত্রের ভারে সেটা প্রায় ফাটবার উপক্রম।

সুলতা বললে, টের না পাইয়ে আসাই যে ঘুমের নিয়ম।

গার্গী বললেন, তা বটে। কিন্তু তুই বাছা এখন কোত্থেকে ? বেলা বারোটা বাজতে চলল, নাওয়া-খাওয়াও তো এখনো হয়নি দেখছি। কাঁধের ওপর এক চৌকিদারী ঝুলি নিয়ে কোথায় ঘুরে বেড়াচ্ছিলি ?

—চৌকিদারী ঝুলিই বটে !—সুলতা মিষ্টি করে হাসল : চৌকি দিয়ে বেড়াচ্ছিলাম কিনা। এই পথ দিয়ে যাচ্ছিলাম, ভারী তেষ্টা পেল। ভাবলাম, জ্যেঠিমার এখান থেকে এক গ্লাস জল খেয়ে যাই।

—খালি খালি জল খাবি কি বেলা বারোটার সময় ?—গার্গী ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠলেন : কী একখানা বাউণ্ডুলে মেয়েই তুই হয়েছিস সুলতা ! এখন কলঘরে যা—চানটা করে একেবারে খেয়ে নে।

—সর্বনাশ! এখানে খেয়ে যাব?

—কেন—খেলে জাত যাবে নাকি?

সুলতা বললে, মা ফায়ার হয়ে থাকবেন।

—থাকলেই হল? একি পরের বাড়ি? যা বলছি তাই কর্‌গে।

সুলতা বললে, সত্যি জ্যেঠিমা, এসব গোলমাল করে দরকার নেই। মা ভারী দুঃখ পাবেন। সেই ভোর-সকালে বেরিয়েছি কিনা! আমি শুধু এক গ্লাস জল খেয়েই চলে যাব।

গার্গী বললেন, তা হলে আমার ঘরে যা। সেফের মধ্যে সন্দেশ আছে, তাই খেয়ে নে গোটা দুই। খবর্দার, খালি পেটে জল খাসনি।

সুলতা চলে গেল।

বেশ মেয়ে—খাসা মেয়ে! গার্গী ভাবলেন: শুধু যদি একটু ঘরমুখো হত! কী যে বাইরের নেশা ধরেছে আজকালকার ছেলেমেয়েদের। ঘরের শান্তিতে আর মন বসে না—বাইরের ঝড়-ঝাপ্‌টার ভেতর ঝাঁপ দিয়ে পড়তে চায় বারবার। সেদিক থেকে তাঁর শুভো অবশ্যই গর্ব করবার মতো ছেলে।

কিন্তু—

কিন্তু আবার সেই অপ্রীতিকর চিন্তা! সুলতা সামনে এলে তাঁর সেটা মনে আসে না—মেয়েটার উজ্জ্বল সুন্দর মুখখানার দিকে তাকালে বুকের ভেতর একটা কোমল স্নেহের ঢেউ ভেঙে পড়ে তাঁর। আর চোখের আড়াল হলেই সেই ভয়—সেই অবাঞ্ছিত ভাবনা। নিজের চারদিকে একটা ঘূর্ণি হাওয়া তুলে ঘুরে বেড়াচ্ছে এই মেয়েটা। সেই ঘূর্ণির টানে যদি শুভোকেও একদিন সরিয়ে নিয়ে যায়—

ধ্বক্ করে উঠল গার্গীর বুকের ভেতরে। দীর্ঘ ছ'বছর ধরে একটা সম্ভাবনাকে বার বার অনুভব করেছেন—বার বার ঠেকিয়ে রাখতে চেয়েছেন দূরে। ভাবতে চেয়েছেন, এ শুধুই আশৈশব পরিচয়ের অন্তরঙ্গতা—এ শুধু সামাজিক আত্মীয়তার স্বাচ্ছন্দ্য। কিন্তু তার বেশি যদি আরো কিছু হয়?

দুদিন থেকেই কেমন বিষণ্ণ হয়ে আছে শুভো। কী যেন বলতে চায়—

অথচ বলতে পারে না। লাল হয়ে ওঠে মুখ, উজ্জ্বল হয়ে ওঠে দৃষ্টি— তারপরে হঠাৎ সরে যায় সামনে থেকে। কী বলতে চায়—কী বলবার আছে শুভোর ?

কোথায় এর শেষ—কী করে এ সমস্যার সমাধান হতে পারে ? চোখের সামনে যেন একরাশ কালো অন্ধকার দেখতে পাচ্ছেন গার্গী। এই পরিবার— এই সংসার তাঁকে মুহূর্তের জন্যে শান্তি দেবে না। দীনেশ তাঁকে কাছে টেনে নিতে পারেননি—আজ কি শুভোও—

সুলতাকে তাঁর বলা উচিত। আজই সময় এসেছে—এসেছে সুযোগ। শুভো বাড়ি নেই—একটা উপযুক্ত অবসরেই তাঁর কাছে এসেছে সুলতা। এখনি বলা দরকার, তোমরা আজকাল বেশ বড় হয়েছ, এখন আর এরকম মেলামেশা—

আবার কি চোখে ঝিম ধরেছিল ? ভয়ানক ভাবে চমকে উঠলেন গার্গী।

সুলতা বললে, বড্ড খিদে পেয়েছিল জ্যেঠিমা, চারটে সন্দেশ খেয়ে ফেলেছি একসঙ্গে।

সুরমা সরে গিয়েছিলেন। এখানে দাঁড়িয়ে থেকে তিনিও স্বস্তি পাবেন না—শুভোও না। অথচ সমস্ত ব্যাপারটা এমন একটা অবস্থায় পৌঁছেছে যে উৎকণ্ঠা আর ঔৎসুক্যে কিছুতেই স্থির থাকতে পারছেন না তিনি। মন্মথের সামনে অনেকখানি আত্মবিশ্বাসের ভাণ করেছিলেন তিনি, বলেছিলেন, গার্গীকে তিনি রাজী করাবেনই। কিন্তু মনে মনে সুরমাও জানেন—জিনিসটা অত সহজ নয়। স্তিমিত শান্তির অবগুণ্ঠনের তলায় একটা অত্যন্ত কঠিন মন আছে গার্গীর। অনেকখানি পর্যন্ত এগিয়ে যাওয়া চলে, অনেক দূর পর্যন্ত অনুভব করা চলে তাঁর প্রীতি আর আত্মীয়তার কোমলতা। তারপর এক জায়গায় এসে একেবারেই থেমে পড়তে হয়। সেখানে আর একবিন্দু প্রশ্রয় নেই গার্গীর, নেই এক কণা দুর্বলতা।

নিজের ঘরের জানালার সামনে এসে দাঁড়ালেন। একটা সেলাই তুলে

নিয়েছেন হাতে, কিন্তু করতে পারছেন না। মন অসহ্য চঞ্চল। সুলতা কাছে থাকলেও ভালো লাগত—একটু জোর পেতেন যেন। কিন্তু হতভাগা মেয়েটা অভ্যাসমতো সারা কলকাতায় টহলদারী করতে বেরিয়েছে। এর চাইতে মেয়েটা জেলে গেলেও নিশ্চিন্ত থাকতেন তিনি—অন্তত একটা বাঁধা জায়গায় আছে জেনে সমস্ত দুর্ভাবনার হাত থেকে মুক্তি পেতেন।

কিন্তু কী হবে শেষ পর্যন্ত? সুরমা জানেন, গার্গী রাজী হবেন না। মন্মথও মিথ্যে কথা বলেন নি। বন্ধুত্বই বটে—আবাল্যের বন্ধুত্ব। দীনেশের পরিবারে কোথাও এতটুকু বিশৃঙ্খলা ঘটার পেছনে মন্মথর কিছুমাত্র ভূমিকা থাকে—এ তিনি চান না। মন্মথ কিছুতেই স্বীকৃতি দেবেন না এই বিয়েতে।

শুভো—সুলতা?

মনশ্চক্ষে দেখতেই পাচ্ছেন সুরমা। ও বাড়ির দরজা বন্ধ হয়ে যাবে—এ বাড়িতেও জায়গা হবে না। তারপর—

...তারপর শুভো মুখ তুলল। টক্‌টকে মুখখানা আরো লাল হয়ে গেছে—একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস শুনতে পেলেন মন্মথ। একটু আগেই পা দুটো অল্প অল্প কাঁপছিল শুভোর—কিন্তু এখন শরীরের সমস্ত পেশী দৃঢ় হয়ে গেছে তার। আস্তে আস্তে বললে, বেশ তাই হবে।

এবার মন্মথ আর শুভোর দিকে তাকাতে পারলেন না। লাল নীল পেন্‌সিলটা তুলে নিয়ে এলোমেলো ছবি আঁকতে লাগলেন সামনের ব্লটিং প্যাডের ওপরে।

—নিজেকে নিয়ে বাজী ধরছ না তো শুভো?

—আপনি তো জানেন কাকা, ও ধরনের কোনো নেশা আমার নেই।

সব নেশাই মানুষ জেনে করে না—শুভোর দৃষ্টিকে এড়িয়ে তার মাথার ওপর দিয়ে চোখ মেলে দিলেন মন্মথ: কোনো-কোনোটাকে সে নেশা বলেও বুঝতে পারে না। তারপর হঠাৎ যেদিন তার মোহভঙ্গ ঘটে সেদিনের ট্রাজেডিটা সব চাইতে করুণ।

—সে কথা ভাবতে চাই না।—গভীর গলায় শুভো বললে, তবে আপাতত

তার কোনো সম্ভাবনা নেই। শুধু এইটুকুই বুঝতে পারছি যে যদি নেশাই হয়—তবু সেই নেশাকে ছেড়ে আজ আমার পক্ষে বেঁচে থাকা অসম্ভব।

বেঁচে থাকা অসম্ভব! মুখের প্রান্তে করুণার হাসি ঘনিয়ে এলেও হাসলেন না মন্মথ। এই বয়স। বর্ষার নদীকেই এখন সত্যি বলে বিশ্বাস হয়—মনে থাকে না ওটা সাময়িক, ওর তিন-চতুর্থাংশই কাদা-বালির বিস্তৃতি। আবেগের সঙ্গে জীবনের সীমান্ত-রেখাটা একরাশ ফেনার মধ্যেই তলিয়ে থাকে এখন। বেঁচে থাকা অসম্ভব? দশ বছর পরে এই শুভোরই মনে হবে মৃত্যু কত কঠিন: বাঁচবার জন্যে কী আকুল আকৃতি!

তবু একটা কথা বলতে পারত শুভো, অন্তত বলা উচিত ছিল তার: ভাবলেন মন্মথ। নেশাই বটে। জীবনে সবই নেশা—সমস্ত সত্যই একটা অভ্যাসের ক্রমিক পুনরাবৃত্তিতে কংক্রীটের গাঁথুনি। মানুষ যখন জন্মায়—তখন সে নির্বিকার—নির্বিকল্প। তারপর পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গে নানা জিনিসকে সে আহরণ করে পরিপার্শ্ব থেকে, সঞ্চয় করে, অভ্যাস করে, বিশ্বাস করে। সেই সঞ্চয়, অভ্যাস আর বিশ্বাসের তিনটি স্তম্ভের ওপর দাঁড়ায় তার সমস্ত সত্য, সমস্ত নীতি। ওর একটা স্তম্ভকে সরিয়ে নাও—মুহূর্তের মধ্যে হুড়মুড় করে ভেঙে পড়বে সব কিছু। নেশা করাটা পাপ—এও সেই আজন্ম সঞ্চিত নেশারই সংস্কার মাত্র।

এই নেশার ঘোরেই গার্গী কিছুতেই শুভো আর সুলতার মিলনকে স্বীকার করবেন না—এই নেশাই বন্ধুত্বের দায়িত্ব হয়ে মন্মথের পথ আটকে দাঁড়িয়েছে।

মন্মথ বললেন, কোনো সাহায্যই আমি করতে পারব না।

শুভো বললে, দরকার নেই।

দরকার নেই? একটা খোঁচা খেলেন মন্মথ, অহমিকায় আঘাত লাগল। শুভো কি ভুলে যাচ্ছে, সুলতা তাঁরই মেয়ে? তবু রাগ করা চলে না। আলোচনাটাকে এই খাতে বইয়ে দিয়েছেন মন্মথ নিজেই।

নিচের ঠোঁটটাকে দুটো দাঁত দিয়ে মন্মথ টিপে ধরলেন, আমার আশীর্বাদও নয়!

এতটার জন্যে শুভো হয়তো তৈরি ছিল না। চমকে উঠল একবার। মাত্র একবারই।

—আজ না পাই, একদিন পাবই।

—হয়তো।—শান্ত স্বরে মন্মথ বললেন: হয়তো। কোনোদিন যদি বৌদি তোমাদের ক্ষমা করেন—একমাত্র সেই দিনই তোমাদের আশীর্বাদ করব আমি। জানি না—ততদিন বেঁচে থাকব কিনা।

শুভোর চোখ চক চক করে উঠল: আমি জানি—সেদিন আসতে খুব বেশি দেরি হবে না।

সত্যিই, কত দেরি করা যায় আর? কতক্ষণ আর বসে থাকা যায় এমন একটা চঞ্চল অনিশ্চয়তা নিয়ে? রিংয়ের আওয়াজ শোনা গেল, ভারী পর্দাটা সরে যাচ্ছে। শুভো চমকে তাকিয়ে দেখল সুরমা এসে ঘরে ঢুকছেন...

...ঘর থেকে সুলতা বেরিয়ে গেলে তবু কিছুক্ষণ উৎকর্ণ হয়ে রইলেন গার্গী। বাড়ির সিঁড়িতে চটির লঘু আওয়াজ—নেমে যাচ্ছে সুলতা। গার্গী কান পেতে শুনতে লাগলেন। মেয়েটার পায়ের শব্দ তাঁর চেনা। উচ্ছল—খুশিতে জীবন্ত। কিন্তু আজ যেন প্রাণের সেই স্পন্দনটা পাওয়া যাচ্ছে না। কেমন ক্লান্ত মনে হচ্ছে ভঙ্গিটা—কেমন অনিশ্চিত। কী যেন হয়েছে সুলতার —কোথায় একটা কিছু বেসুরো ঠেকছে।

সত্যিই কী যেন হয়েছে সুলতার! এতক্ষণে যেটা চোখে পড়েও পড়েনি —এবারে সেটা যেন স্পষ্ট হয়ে উঠতে লাগল গার্গীর কাছে। সুলতার সুকুমার উজ্জ্বল মুখে ছায়া নেমেছে, কালির চিহ্নও যেন দেখতে পেয়েছেন চোখের কোলে। পথে পথে ঘুরে বেড়ানো? অনিয়ম? সভা-সমিতি?

না, ঠিক তাও নয়। দেহের ক্লান্তি আর মনের ক্লান্তি—দুটোর সুস্পষ্ট আলাদা চেহারা আছে। শেষেরটাই কি এসেছে সুলতার? একটু আগেকার নিতান্ত সাধারণ কথাবার্তাগুলো যেন কেমন একটা অর্থমণ্ডিত হয়ে উঠতে লাগল গার্গীর কাছে।

—এখান থেকে চলে গেলে কেমন হয় জ্যেঠিমা?—গার্গীর উলটা তুলে

নিয়ে অন্যমনস্কভাবে কয়েকটা ঘর বুনে দিতে দিতে উদাস প্রশ্ন করেছিল সুলতা।

—ও আবার কী কথা?—গার্গী চকিত হয়ে উঠেছিলেন।

—না এম্‌নি। ভারী একঘেয়ে লাগছে কলকাতায়।

—ও, এই কথা?—গার্গী বলেছিলেন: তোদের তো বাড়ি রয়েছে মধুপুরে। ঘুরে আয় দিন কয়েক।

—মধুপুর? সুলতা হেসেছিল: মধুপুর যাওয়া আর শ্যামবাজারে যাওয়া একই কথা। সেই চেনা মুখ, হয় হাতীবাগানের পিসিমা, নয়তো বাগবাজারের রমেশ কাকা। ওর চেয়েও অনেক বেশি দূর ঘুরে আসতে ইচ্ছে করছে।

গার্গী বলেছিলেন, বেশ তো, একটা মাত্র মেয়ে—বাপের তো পয়সার অভাব নেই। ঘুরে আয়—হিল্লী-দিল্লী যেখানে খুশি।

উঁহু, বাবার পয়সায় নয়। যাব নিজের জোরে—যেখানে হোক, একটা চাকরী-বাকরী জুটিয়ে নিয়ে—

—চুপ কর্।—গার্গী ধমক দিয়েছিলেন: লেখাপড়া ছেড়ে দিয়ে এখন এসব কুবুদ্ধি ঢুকেছে মাথায়। কাল সন্ধ্যে বেলাতেই তো সব আসছে। তখন তোর বাপকে বলব, মেয়েটাকে এখন পার করে দিয়ে—

বলতে বলতে হঠাৎ থেমে গিয়েছিলেন গার্গী—কথাটায় নিজের মনেই চমক লেগেছিল একটা। আবার সেই অস্বস্তিকর ভাবনা। শুভোর মুখখানা ভেসে উঠেছিল চোখের সামনে। কদিন থেকেই কী যেন ভাবছে, কেমন যেন অন্যমনস্কতা। কিছু একটা বলতে চায়—বলতে পারে না! যদি—যদি—

গার্গীর সমস্ত অস্বস্তি তলিয়ে দিয়ে লঘু কণ্ঠে হেসে উঠেছিল সুলতা।

—কী যে তোমাদের হয় জ্যেঠিমা—একটু বয়েস বাড়লে বুঝি কেবল ঘটকালি করতেই ইচ্ছে করে? নাঃ, এবার আমি সত্যিই পালাব। আর দেরি হলে মা আমায় আস্ত রাখবে না।

তার পরেই উঠে গিয়েছিল সুলতা।

সুলতার হাসির প্রলেপে যা সাময়িকভাবে আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছিল, ওর যাওয়ার পদক্ষেপ শুনতে শুনতে সেইটেই এবার দ্বিগুণ ভাবে চাড়া দিয়ে উঠল।

কিসের ক্লান্তি এ—কিসের ক্লান্তি? যে শ্রান্তির ছায়া তিনি শুভোর মুখে দেখতে পেয়েছেন, একি তারই প্রতিচ্ছবি? অবর্ণনীয় ভয়ে পাণ্ডুর হয়ে গেলেন গার্গী। এ তিনি কোথায় দাঁড়িয়ে আছেন, কোন্ সমুদ্রের মোহানায় তুলতে চাইছেন বাধার প্রাচীর? প্রাচীর থাকবে না,—কিন্তু তার ধ্বংসস্তূপ বুকে বিঁধে থাকবে চিরকালের একরাশ কাঁটার মতো; দু'জনের ওপর জেগে থাকবে তাঁর নিষ্ঠুর কালো অভিসম্পাত!

কেন মুখ ফুটে বলতে পারলেন না সুলতাকে? যে-কথা মনে এসেছিল গোড়াতেই—কেন নিষ্ঠুর ভাষায় প্রকাশ করলেন না সে কথা? কেন সুলতার মুখের দিকে তাকিয়েই তাঁর সমস্ত মন একটা সীমাহীন স্নেহে কোমল হয়ে এল? তবে—তবে কি তিনিও সুলতাকে পুত্রবধূরূপে পেলেই খুসি হবেন? নিজের অজ্ঞাতেই কখনো কি তিনি সুলতাকে তাঁর ঘরে বরণ করে নিয়েছেন: স্নিগ্ধ আশীর্বাদে, শান্ত দাক্ষিণ্যে? বরণের পঞ্চপ্রদীপে, শুভ শঙ্খের ধ্বনিতে?

গার্গীকে যেন সাপে ছোবল মারল। চোখ তুলে চাইলেন তিনি। সামনেই দেওয়ালের গায়ে দীনেশের আবক্ষ বিরাট ছবিখানা। অদ্ভুত জীবন্ত দৃষ্টিতে দীনেশ তাকিয়ে আছেন তাঁর দিকে। দীনেশের দু' চোখে অসহ্য ক্রোধের জ্বালা—তীক্ষ্ণ, মর্মান্তিক ধিক্কার!

সারা জীবন তিনি দীনেশকে দুঃখ দিয়েছেন। সুখী করতে পারেন নি একদিনের জন্যে, রফা করতে পারেন নি এক মুহূর্ত। মেনে নিয়েছেন, বশ্যতা স্বীকার করেন নি। প্রতিবাদে অসহিষ্ণু আর উদ্ধত হয়ে থেকেছে তাঁর সমস্ত চেতনা—এক বিন্দু বিনম্র শ্রদ্ধা জাগিয়ে স্বামীর প্রতি কর্তব্য পালন করতে পারেন নি তিনি। আর—তাঁরই জন্যে অমন করে দীনেশের মৃত্যু ঘটেছে, সে অকাল-মৃত্যুর জন্যে তিনিই দায়ী।

যদিদং হৃদয়ং তব, তদিদং হৃদয়ং মম। কিন্তু হৃদয়ে তো মিলন ঘটল না কোথাও। ছায়ার মতো দীনেশকে তিনি অনুগমন করেন নি। তাঁর নিজের ব্যক্তিত্ব—নিজের শিক্ষা দীক্ষা! স্বামীকে বারে বারে তিনি দেখেছেন বর্বরের ভূমিকায়—চন্দ্রশেখরের মহিমোজ্জ্বল মূর্তি যখনই দৃষ্টির সামনে ভেসে উঠেছে, তখনই মনে হয়েছে কী ব্যর্থ দীনেশ—কী অর্থহীন!

যৌবনের দিনগুলো তাঁর কেটেছে সেই ঔদ্ধত্যের মধ্য দিয়েই। কিন্তু স্বামীর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে এল আত্মধিক্কারের পালা—এল পুনর্বিচারের অধ্যায়। তিনি সুখী হন নি—অথচ, দীনেশকেই কি সুখী করতে পেরেছেন? তাঁর নিজের সমস্ত সত্তা বিসর্জন দিয়ে—আদর্শ হিন্দুনারীর মতো স্বামীর পদাঙ্কই কি তাঁর অনুসরণ করা উচিত ছিল না?

কিন্তু যা হওয়ার তা হয়ে গেছে। এখন প্রায়শ্চিত্তের পালা। দীনেশের ছবিখানা কঠিন গম্ভীর দৃষ্টিতে চেয়ে আছে—চেয়ে আছে এই বাড়ির ওপরে সতর্ক পর্যবেক্ষকের মতো। ওই চোখের সামনে, ওই কঠিন দৃষ্টির সামনে—সাধ্য কি গার্গীর—আজ নতুন বিপর্যয় ঘটাবেন একটা?

ঢং করে একটা বাজল। একটা অদ্ভুত সর্দি-জড়ানো আওয়াজ—এই পুরু পুরু দেওয়াল আর ভারী ভারী ফার্নিচারের ছায়ার আড়াল থেকে যেন একটা প্রেতধ্বনি। গার্গী সভয়ে উঠে দাঁড়ালেন।

*　　　*　　　*

শীতের রোদেও ফুটপাথটা যেন জ্বলে উঠেছে। গরম ব্লাউজটায় আরো গরম লাগছে গায়ে। কপালের ওপর জমে-আসা ঘামের কণাগুলো হাতের পিঠে মুছে ফেলল সুলতা—তাকাল সামনের দিকে।

আঃ, এত দেরী করছে কেন ট্রামটা?

নিজের ছায়া সংক্ষিপ্ত হয়ে আসছে পায়ের কাছে। মাথার ওপর তীক্ষ্ণ কণ্ঠে ডাক দিয়ে উড়ে গেল ক্ষুধার্ত চিল। ট্রামের লাইন দুটো সদ্য-মাজা রুপোর রেখার মতো ঝক্‌ঝকে। ভালো করে তাকিয়ে দেখতে গেলে চোখে যেন খোঁচা লাগে।

কী আশ্চর্য উত্তপ্ত এই শীতের দুপুর !

চলে যাবে—এখান থেকে চলেই যাবে সুলতা। না হলে তার মুক্তি নেই। শুভোর অনেক আগেই নিজেকে সে চিনতে পেরেছিল—ভোলার জন্যেই এমন করে ঝাঁপ দিয়েছিল বাইরের কাজে। কিন্তু কিছুই হচ্ছে না। আজ বুঝতে পেরেছে—একটা সংকট মুহূর্ত আসছে ঘনিয়ে। যা করার এখুনি করে ফেলতে হবে—আর বিলম্ব করা চলে না।

বাইরের কোথাও চলে যাবে সুলতা। কাজের অবসর, মনের মুক্তি। এখানে যা কিছুতেই হয়ে উঠছে না, দূরে সরে গেলে তার মধ্যেই সে হারিয়ে যেতে পারবে। আর শুভো? আদর্শ ভালো ছেলে সে—। দু'দিন বিষণ্ণ হয়ে থাকবে, তারপর মায়ের আদর্শ অনুসরণ করে নিভু'লভাবে বয়ে নিয়ে চলবে জীবনকে। তা ছাড়া রিসার্চের কাজও সে আরম্ভ করেছে, তার মধ্যে একবার তলিয়ে গেলে কোথায় সুলতা—কোথায় কে !

কিন্তু শীতের রোদটা কী আশ্চর্য জ্বলন্ত ! কপাল বেয়ে ঘাম পড়ছে, না চোখের জল গড়িয়ে আসছে সুলতার? আঃ—এখনো কেন আসছে না ট্রামটা ! মাঝে মাঝে কী যে হয় ওদের লাইনে ! সারি সারি রূপোর সাপের মতো জ্বলছে পাশাপাশি ইস্পাতের সরল রেখা !

চোখে কেন ধোঁয়া ধোঁয়া লাগছে এমন ভাবে ? সারা শরীর বেয়ে ক্লান্তি উঠছে জড়িয়ে জড়িয়ে। এই ফুটপাথের ওপরেই বসে পড়লে মন্দ হয় না।

সুলতাকে চমকে দিয়ে পাশে একখানা গাড়ি এসে থামল। শুভো।

—একি ! তুমি এখানে ?

—বাড়ি ফিরছি। তোমাদের ওখানে গিয়েছিলাম। জ্যেঠিমার কাছে জল চেয়ে সন্দেশ পেলাম।—সুলতা হাসতে চেষ্টা করল : আচ্ছা, তুমি যাও। আমার ট্রাম আসছে।

—ট্রাম কী হবে ?—রক্তহীন বিবর্ণ ঠোঁটে শুভো বললে, চলো তোমায় পৌঁছে দিয়ে আসি।

—না না, থাক। এইমাত্র তুমি এলে, কষ্ট হবে।

—সৌজন্তের বিনয় এখন ভালো লাগছে না স্থ। ওঠো গাড়িতে।

শুভোর চোখের দিকে তাকিয়ে স্থলতা হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে গেল। বিবর্ণ ঠোঁটের সমস্ত রক্ত সঞ্চিত হয়েছে শুভোর চোখে। যেন দু ঘণ্টা ধরে স্নান করে এসেছে, এমনি তার চোখের রঙ।

—শুভো, শুভো, তোমার কী হয়েছে?

—চলো, গাড়ীতে যেতে যেতেই বলি।—শুভো খুলে ধরল দরজাটা।

বিহ্বলভাবে উঠে এল স্থলতা। পাশে বসে পড়ে বিভ্রান্ত গলায় বললে, শুভো—

কাঁপা হাতে গীয়ার ঠিক করতে করতে শুভো বললে, আজ তোমার কোনো কথাই বলবার নেই স্থ। যা বলবার আমি বলব।

—আচ্ছা, বেশ।

গাড়ি চলতে লাগল। সামনের উইণ্ড-স্ক্রীনটার ওপর সোজাস্থজি দুপুরের রোদ এসে পড়েছে। সেই রোদে শুভোর মুখ জ্বলছে, কপাল জ্বলছে, স্টিয়ারিঙের ওপরে রাখা হাতের আঙুলে আংটিটা জ্বলছে। তবু ভালো যে এখনো স্থলতা তার চোখ দুটো দেখতে পাচ্ছে না।

—কী বলবে?

—কাকা রাজী হননি।—একটা বাসকে পাশ কাটিয়ে শুভো বলে চলল, সম্মতি তিনি দেবেন না, কিন্তু বাধাও দেবেন না। আমরা যথেষ্ট বড় হয়েছি, অতএব আমাদের ইচ্ছার প্রতিবাদ তিনি করবেন না। কিন্তু যেদিন থেকে ও-বাড়ি থেকে আমরা বেরিয়ে আসব, সেদিনই বন্ধ হয়ে যাবে বাড়ির দরজা।

—আমি জানতাম। স্থলতা হাসল : আর মা?

—শুধু চোখের জল ফেললেন। আর তাঁর বলার কিছু ছিল না।

কিছুক্ষণ চুপ করে রইল দু জনেই। তারপর :

শুভো, কী হবে এসব পাগলামী করে? তোমার জন্তে অনেক রাজকন্তা অর্ধেক রাজত্ব নিয়ে অপেক্ষা করছে।

—রাজকন্যা সংসারে অনেক আছেন, রাজপুত্রও তাঁদের অনেক জুটবে। কিন্তু এভাবে আমাকে আঘাত দিয়ে লাভ নেই সু। কথা হল, ও-বাড়ি থেকে তুমি কি এত সহজে বেরিয়ে আসতে পারবে?

—কিন্তু কোন্ বাড়িতে ঢুকব? তোমার বাড়ির দরজাও কি খোলা থাকবে?

—জানি না। হয়তো থাকবে না।

—তা হলে কেন আমি এমন করে ঝাঁপিয়ে পড়ব তোমার সঙ্গে?

—সুলতা!

—আদর্শ ভালো ছেলে তুমি, পৃথিবীর কিছুই তোমার জানা নেই। তাই এটাও তুমি জানো না যে, মেয়েরা ঘর বাঁধে আশ্রয় পাওয়ার জন্যে, নিরাশ্রয় হয়ে স্রোতে ভেসে পড়বার জন্যে নয়!

শুভোর হাত থেকে পিছলে গেল স্টিয়ারিং, মাড-গার্ড ঘেঁসে গেল ল্যাম্পপোস্ট্কে। একটু হলেই একজন রিক্শওয়ালাকে চাপা দিয়ে বসত।

সুলতা চেঁচিয়ে উঠল: ছিঃ ছিঃ, একি পাগলামি করছ! এখনি যে অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে যেত!

পনেরো

গাড়িটা সামলে নিয়ে শুভো বললে, এখন তোমার বাড়ি ফেরা হবে না।

সুলতা ক্লান্ত দৃষ্টি তুলল: তার মানে? এই বেলা একটার সময় আবার কী খেয়াল চাপল তোমার মাথায়!

—খেয়াল নয়। চলো, কোথাও বসি।

—বেশ তো, আমাদের বাড়িতেই চলো আবার! যতক্ষণ খুশি বসবে সেখানে।

—না-না, আর কোথাও।

—এ আবার কী?—তেমনি ক্লান্ত অনুতাপ চোখ সুলতার: সারাদিন আজ খেতে দেবে না আমাকে?

—কোনো হোটেলে খাইয়ে দেব। আমারও খাওয়া হয়নি এ পর্যন্ত।

—বাড়িতে তৈরি রান্না পড়ে থাকতে হোটেলের শুকনো ভাত এখন গলা দিয়ে নামবে না আমার! তার মানে, আজ উপোস করিয়ে রাখতে চাও আমাকে।

—ক্ষতি কী! না হয় উপোসই করা গেল দুজনে। মনে করা যাক না—কথাটা বলতে গিয়ে উত্তেজনায় কেঁপে উঠল শুভোর ঠোঁট: মনে করা যাক্ না—আজ আমাদের বিয়ের দিন।

এমন নিরাবরণ হয়ে কথাটা এল যে মুহূর্তে রাঙা হয়ে গেল সুলতার মুখ, নিবিড় লজ্জায় বন্ধ হয়ে এল চোখের পাতা দুটো। ফিস্‌ফিস্ করে সুলতা বললে, শুভো!

অসহ্য অন্তর্দহনে শুভোর চোখ দপ্‌দপ্ করতে লাগল: আর কথা নয়। অনেক দেরী হয়ে গেছে, আর আমি পারছি না। আজ অন্তত তোমার কাছ থেকে হিসেবটা পরিষ্কার করে নিতে চাই আমি। এই গাড়ী ঘোরাচ্ছি।

—কিন্তু—কিন্তু বাড়ীতে?

—কৈফিয়ৎ অনেক দেওয়া হয়েছে সু। আজ শাসন না মানবার পালা।

—শুভো—সুলতা ছোট্ট করে ডাকল। এখনো শুভ্র গালে লজ্জার কুঙ্কুম-রাগ, এখনো সংকোচে ভারী হয়ে আছে চোখের পাতা, তবু সুলতা আত্মস্থ হয়ে এল: ক্রমশ কিন্তু মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছ তুমি। যেটা নাটক ছিল, সেটাকে করে তুলছ মেলোড্রামা।

—তা হোক। আমার কাছে জীবন যদি মেলোড্রামাটিক হয়ে দেখা দেয়, তা হলে সেটাই সত্য।

—কিন্তু ওটা বাড়াবাড়ি।

—সৌন্দর্য জিনিসটাই বাড়াবাড়ি সু! জীবনটা আঁটোসাঁটো বাঁধাধরা, কবিতা তার বাড়াবাড়ি। গাছ এমনিতেই বীজ ছড়াতে পারত, ফুলটা তার এক্সেসেস্। তেমনি নাটকের মেলোড্রামাও তার ফুল।

একটা গলির মধ্যে গাড়িটাকে ব্যাক করিয়ে মুখ ঘোরাতে ঘোরাতে শুভো বললে।

—শুভো, এই কি তোমার এস্থেটিকস্ আলোচনার সময়?

—সব চেয়ে রক্তাক্ত মুহূর্তেই সব চেয়ে বড় কবিতার জন্মক্ষণ—শাণিত গলায় শুভো জবাব দিলে: মন যত জটিল হয়ে ওঠে, চিন্তা তত বাঁকা রাস্তা ধরতে চায়। কিন্তু কথার ফুলঝুরি কাটতে আমারও ভালো লাগছে না সু। আজ ঘণ্টাখানেকের জন্যে তোমাকে কাছে পেতে চাই—পেতে চাই একান্ত করে। সোজা শাদা ভাষায় কয়েকটা কথা তোমাকে বলতে চাই।

—এর মধ্যে কি তা এখনও বলা হয়নি? এতদিনেও?

—হয়তো হয়েছে, হয়তো হয়নি। কিন্তু আজ যা বলব, তার আলাদা একটা মানে আছে।

যে দিক থেকে গাড়ি এসেছিল, সে মুখেই আবার ফিরে চলল।

—কিন্তু কোথায় যাবে?

—লেকে।

সুলতা হেসে উঠল: মেলোড্রামাটাকে লেকে শেষ করতে চাও নাকি? দুজনে মিলে ডুবে মরব সেখানে? কিন্তু ওতে আমি রাজি নই শুভো। এত তাড়াতাড়ি মরবার জন্যে বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই আমার। জীবনকে আমার ভালো লাগে—আরো অনেকদিন ধরে আমি বাঁচতে চাই।

এতক্ষণে শুভোর গলাতেও ক্লান্তির আমেজ ফুটে বেরুল: আমারও সেইটেই বলবার কথা সু। আমি বাঁচতেই চাই। এতদিন পাশ কাটিয়ে গেছ, আজ আর এড়াতে পারবে না। এবার আমার সব কথা ধৈর্য ধরে তোমায় শুনতে হবে—উত্তর দিতে হবে সব কথার। এমন করে আর আমি ছায়ার পেছনে ছুটে বেড়াতে পারছি না।

ছায়া? সুলতা ভ্রুকুঞ্চিত করল। সব বুঝেও কেন বুঝতে চায় না শুভো—সব কিছুকে কেন এমনভাবে অনাবৃত করে ফেলতে চায়? কেন

একথা বুঝতে পারে না যে রাত্রির ছায়ার আড়ালে যা একটু একটু করে ফোটে, দিনের খরতর আলো সে সইতে পারে না?

সুলতা সীটের সঙ্গে এলিয়ে দিলে নিজেকে: বেশ, আজ তোমার ইচ্ছের ওপরেই নিজেকে ছেড়ে দিলাম। অত্যন্ত স্পষ্ট করে না শুনলে যদি খুশি না হও, আমিও কোনো আবরণ রাখব না।

রোদে ঝলকানো লেক। নারকেলের পাতায় পাতায় মর্মর। দূরের একটা ছোট আইল্যাণ্ডে এক টুকরো ছায়াঘন আরণ্যক অনুবৃত্তি।

শুভো সংক্ষেপে বললে, কী করা যায় বলো।

—আপাতত লেকের ঢেউ গোণা চলে।

—হুঁ।

—কেন ছেলেমানুষি করছ শুভো? এসবের কোনো মানেই হয় না।

শুভো একমুঠো ঘাস আঁকড়ে ধরল: আজ কি চূড়ান্ত নিষ্ঠুর হওয়ার সংকল্প করেছ তুমি?

বেদনাভরা দৃষ্টিতে সুলতা বললে, একটা বয়স থাকে শুভো, যখন সমুদ্রের চাইতেও ভালো লাগে তার ফেনাকে। মাটির চাইতে বেলুনকে অনেক বেশি খাঁটি বলে মনে হয়। তোমার সেই দশাই হয়েছে।

—ওসব কথা বলে আজ তুমি পাশ কাটিয়ে যেতে পারবে না। থিয়োরী আমিও একরাশ মুখস্থ বলে যেতে পারি। কিন্তু সত্যটা এই যে, তুমি আমার সঙ্গে নেই—জীবনে এমন একটা দিন আমি কল্পনাও করতে পারছি না।

—আজ যেটা কল্পনার বাইরে কাল সেটাকেই সব চেয়ে স্বাভাবিক মনে হবে।

—না, হবে না!—আহত ক্ষোভে এবারে শুভো প্রায় আর্তনাদ করে উঠল: তুমি কি জানো, কখনো কখনো এমন এক একটা সময় আসে—যখন রাতের পর রাত চোখের পাতায় এতটুকু ঘুমের ছায়া নামে না? যখন মাথার ভেতর রক্ত ফেটে পড়তে চায়—বুকের শিরাগুলো যন্ত্রণায় ছিঁড়ে যেতে

থাকে ? এ যেলোড্রামা নয় সু—পাগলামি নয়, একরাশ রোমান্টিক প্রলাপ নয়। এ শারীরিক যন্ত্রণা—যে যন্ত্রণায় মানুষ ছুরি দিয়ে নিজের আঙুল কেটে ফেলতে পারে, খুন করতে পারে। সু, তুমি কি বুঝতে পারো না ?

বুঝতে পারে বই কি সুলতা। এমন কত বিনিদ্র রাত তো তারও কেটেছে—তারও বুকের মধ্যে অসহ্য জ্বালায় মোচড় দিয়ে উঠেছে কত দিনের পর দিন। তবু অনেক আগেই জানত সুলতা—অনেক আগেই বুঝতে পেরেছিল। স্বেচ্ছায়-সজ্ঞানে শুভোকে কখনো সে প্রশ্রয় দেয় নি। ছেলে-বেলার সেই অন্তরঙ্গ একান্ত পরিচয়ের সীমাটুকুই মেনে এসেছে বরাবর। লাজুক ভালো ছেলে শুভো যেখানে এসে থমকে গেছে, যেখান থেকে আশা করেছে সুলতার সাড়া—সেইখানেই সুলতা তুলে দিয়েছে স্তব্ধতার প্রাচীর।

ভেবেছিল—কল্পনাতীত তীব্র বেদনার মধ্যে ভেবেছিল, এমনিই চলবে। মৈত্র বাড়ির গণ্ডিটানা চৌহদ্দির বাইরে শুভো কোনোদিন বেরিয়ে আসতে পারবে না, নিজের ভীরুতায় নিজেই থাকবে সংকীর্ণ হয়ে। এমন কি, যথানিয়মে নির্বাচিতা একটি সুলক্ষণা সালঙ্কারা বধূকে আনবার জন্যে যেদিন সে ময়ূরপঙ্খী মোটরে টোপর পরে যাত্রা করবে—সেদিনেও বলা যায় না : হয়তো মুখে একটুকরো হাসি ফুটিয়ে মা-কে বলবে, মা, দাসী আনতে যাচ্ছি তোমার জন্যে।

কল্পনায় ছবিটা দেখেছে সুলতা। দাঁতে দাঁত চেপে আস্বাদন করেছে এই অসহ্য কল্পনার যন্ত্রণাভরা আনন্দ—আত্মনিগ্রহের অকরুণ উল্লাস। তারপরে কলেজে একটা ধর্মঘটের উপলক্ষ্যে যেদিন সে রাজনীতির স্পর্শ পেল, সেদিন সে পরম আগ্রহে ঝাঁপ দিয়ে পড়ল তার মধ্যে ; কোনোমতে একটা সাধারণ অনার্স নিয়ে বি-এ পাশ করে পুরোপুরি সঁপে দিলে কাজের ভেতরে। যতখানি নিজের কাজ, তার ওপরে অনেকখানি চাপিয়ে নিলে সে—শুরু হল বরানগর থেকে বজবজ পর্যন্ত পরিক্রমা।

সুলতা জানে নিজেকে। বিচার করেছে মনকে, দেখেছে তন্নতন্ন বিশ্লেষণের ভেতর দিয়ে। রাজনীতির পেছনে প্রাণের তাগিদ একেবারে না

ছিল তা নয়, কিন্তু তার চাইতেও হয়তো বেশি ছিল নিজের কাছ থেকে পালিয়ে যাওয়ার প্রেরণা। কখনো কখনো অপরাধের গ্লানি এসেছে—কিন্তু যুক্তি দিয়ে তাকে যথাসাধ্য খণ্ডন করেছে সুলতা। নিজের অনেকখানি বর্জন করেই তো দেশের কাজ; ব্যক্তি-স্বার্থকে ভুলে যাওয়ার মধ্য দিয়েই তো দলের সাধনা। ভালো ছেলে শুভোরা নিজেদের মতো করে ঘর-সংসার করুক, সুখী হোক; অধ্যাপক হওয়ার বাসনা আছে শুভোর—জ্ঞানদান করুক দেশের ছাত্রদের। তার পথ সে বেছে নিয়েছে।

কিন্তু দু দিন ধরে শুভো যা করছে, তার জন্যে প্রস্তুত ছিল না সুলতা। দীর্ঘদিনের অবদমনগুলো যেন আকস্মিকভাবে মুক্তি পেয়েছে। ভীরু যখন মরীয়া হয়ে ওঠে, তখন চূড়ান্ত দুঃসাহসীর চেয়েও সে মারাত্মক—তার অসাধ্য তখন কিছুই থাকে না আর। চিরদিন যে নীরোগ, তার ব্যাধি দেখা দেয় মৃত্যুব্যাধি হয়ে। শুভোরও কি তাই হল? পাহাড়ী নদীর শুকনো খাতে একটি বর্ষণের ফলেই যেমন দুকূল ছাপানো সর্বনাশা বান আসে—শুভোর মধ্যেও সেই প্রচণ্ড মত্ততার ঢল্ নেমেছে। কেমন করে তাকে নিবৃত্ত করবে সুলতা, তাকে রোধ করবে কী উপায়ে?

ঝিলমিলে লেকের জল।

নারকেল পাতায় ট্রেমোলার মতো অবিচ্ছিন্ন কম্পমান ধ্বনিতরঙ্গ।

সামনের আইল্যাণ্ডটায় আরণ্যক ছায়াখণ্ড।

স্তব্ধতা।

পেছনের রাস্তা দিয়ে শব্দের ঝড় তুলে গড়িয়াহাটার দিকে চলে গেল জীর্ণ একটা দোতলা বাস। আলোর সুর কাটল; আইল্যাণ্ড থেকে এক টুকরো ছোট পাথর টুপ করে লেকের জলে পড়ল, আর স্তব্ধ মুহূর্তগুলো ছিন্ন ছিন্ন কুয়াশার মতো—উড়ন্ত উজ্জ্বল একরাশ শিমুল বীজের মতো জলন্ত রোদের মধ্যে মিলিয়ে গেল।

—কথা বলো সু, কথা বলো।—শুকনো পাতার ওপর এক এক ফোঁটা শিশির পড়বার মতো প্রত্যেকটা শব্দকে ছেড়ে দিয়ে বললে শুভেন্দু।

—কী বলব? স্বর গভীর হয়ে আসছে সুলতার। শুভোর মনে শিশির পড়ছে, তার চেতনায় নামছে কুয়াশা।

—চলো বেরিয়ে পড়ি।

—কোথায়?

—নিরুদ্দেশ যাত্রায় নয়। কলকাতার আর কোথাও বাসা করব দু'জনে। আর বাইরে যদি চাকরী পাই, তাতেও আপত্তি নেই আমার।

—আর আমার রাজনীতি?

—আমি কি বাধা দেব?—তেমনি আস্তে আস্তে শুভো বলে চলল: আমি জানি লতা, ছেড়ে রাখলেই সবচেয়ে বেশি করে পাওয়া যায়। তোমার কাজ তুমি করবে, আমার কাজ আমি করব। দিনের কাজে যে দুটো ধারা চলবে পাশাপাশি—তারা এক হয়ে মিলবে রাত্রির মোহানায়!

—যদি জেলে যাই?

—ভয় নেই, বণ্ড্ সই করতে বলব না তোমাকে।—একটা নিষ্প্রাণ হাসি ফুটে উঠল শুভোর ঠোঁটে: যেদিন জেল থেকে বেরিয়ে আসবে, সেদিন জেল-গেটে মালা নিয়ে অপেক্ষা করব তোমার জন্যে।

—কিন্তু গোড়ার কথায় আবার ফিরে আসতে হল শুভো! মা?

মুহূর্তের জন্য আন্‌মনা হয়ে গেল শুভো, অস্থির আঙুলে কী যেন খুঁজতে লাগল এক গুচ্ছ সবুজ ঘাসের মধ্যে। তারপর বললে, মা ক্ষমা করবেন।

—করবেন না।

—তা হলে—শুভো আবার থামল: তা হলে সেই ক্ষমা না-পাওয়ার ক্ষোভটাই বয়ে চলব চিরকাল।

সুলতা যেন অন্তিম চেষ্টা করতে লাগল: কিন্তু কী করছ তুমি, ভালো করে ভেবে দেখো একবার। মনে করে দেখো—একমাত্র ছেলের জন্যে জীবনে কত বড় দাম দিয়েছেন তিনি।

—যিনি একদিন এতবড় দাম দিয়েছেন, আজ তাঁকে কার্পণ্যের দীনতা থেকে মুক্তি দিতে চাই সু। একদিন আমাদের বাড়ীতে মা নতুন দিনের ঝড়

ভুলেছিলেন। আজকের দিনেও তাঁকে পিছিয়ে থাকতে দেব না। স্বেচ্ছায় না দিন—তাঁর অনিচ্ছার অর্ঘ্যেরও প্রয়োজন আছে।

সারাদিনের অস্নাত অভুক্ত সুলতা ঝাপসা দৃষ্টিতে সামনের আইল্যাণ্ডটার দিকে তাকিয়ে রইল। ওই ছায়ার চারদিকে ঝিলমিলে জলটা যেন আঘাত করছে চোখের রেটিনায়; নারকেল পাতার ট্রেমোলাটা একটা চাপা গোঙানির মত শোনাচ্ছে যেন। তেমনি ঝড়ো গতিতে চলে যাচ্ছে আর একটা ডবল ডেকার—কোথাও কোনো অ্যাক্সিডেণ্ট ঘটাবে না তো?

—আমার শেষ কথা কি আজই বলতে হবে শুভো?

—আজই। প্রত্যেকটা দিন আমাকে ছিঁড়ে খাচ্ছে সু।

—আর একটা দিন অপেক্ষা করো তবে।—সুলতা দীর্ঘশ্বাস ফেলল: শুনেছি, কাল সন্ধ্যায় তোমাদের ওখানে আমাদের নিমন্ত্রণ। সেই সময়—সকলের সামনে আমার যা বলবার আছে বলব।

—সেই সময়? সকলের সামনে?—নিভে গেল শুভো, বিবর্ণ হয়ে গেল মুখ।

সুলতা বললে, ভয় করছে?—হঠাৎ সামনের রোদ থেকে কুড়িয়ে নেওয়া এক ঝলক আলা ঠিকরে পড়ল তার চোখ থেকে: বীরের মতো দাঁড়াতে চাও, না চোরের মতো পালাতে চাও তুমি?

নারী বীরশুল্কা। প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে আজ পর্যন্ত। পৌরুষের কষ্টি পাথরের বরমাল্য পরবার কণ্ঠ নির্ণয়। সুলতার চাইতেও দ্বিগুণ জ্বালায় দীপিত হল শুভোর চোখ: তাই হোক। তারপর চাপা গলায় আবৃত্তি করলে:

> ফিরালে মোরে মুখ?
> এ শুধু মোরে ভাগ্য করে ক্ষণিক কৌতুক।
> তোমার প্রেমে আমার অধিকার
> অতীত যুগ হতে সে জেনো লিখন বিধাতার—

অবসন্ন স্বরে সুলতা বললে, এত বেলায় রবীন্দ্রনাথকে আর বিব্রত কোরো না। এবার আমাকে বাড়ীতে পৌঁছে দাও।

ষোল

টেবিলটা আর গোছানো হল না। যেখানে ছিলেন, সেখানেই দাঁড়িয়ে রইলেন গার্গী।

অপ্রত্যাশিত? আকস্মিক? না—কিছুই নয়। যেন অবচেতনভাবেই এই মুহূর্তটির জন্যে তিনি প্রতীক্ষা করছিলেন দিনের পর দিন। নিজের মধ্যে তৈরী করছিলেন একটা নিঃশব্দ প্রতিরোধ। নিছক অনুমান বলে একান্তে যাকে সরিয়ে রেখেছিলেন—নিজেও তিনি জানতেন, অনুমানের সীমানা তা পেরিয়ে গেছে অনেক আগেই।

বহুবার বলতে চেয়েছেন—পারেন নি। শুভোর ঘরের সামনে এসে থমকে দাঁড়িয়েছেন—ইতস্তত করেছেন কয়েক মুহূর্ত, তারপর নিঃশব্দে ফিরে চলে গেছেন। ঘরের ভেতর, টেবিলের সামনে, পড়ার বইয়ের মধ্যে অতলে তলিয়ে থেকেছে শুভো, তাঁর পায়ের শব্দ শুনতেও পায়নি। কখনো কখনো সন্ধ্যায় ছাতের উপর শীতল পাটি বিছিয়ে উৎকণ্ঠিত ভাবনায় তারাভরা আকাশের দিকে তাকিয়ে বসে থেকেছেন গার্গী—পাশে এসে বসেছে শুভো, আদুরে ছোট ছেলের মতো শুয়ে পড়েছে মায়ের কোলে মাথা রেখে। ছেলের কোঁকড়ানো সিল্কের মতো চুলগুলোর মধ্যে আঙুল বুলোতে বুলোতে এক সময়ে থেমে গেছে গার্গীর হাত—একটা দুর্বার জিজ্ঞাসা এসে থমকে গেছে ঠোঁটের কোণায়, তবু বলতে পারেন নি। সংকোচ নয়—ভয়। অবগুণ্ঠিত সত্যের উদ্ঘাটিত স্বরূপকে প্রত্যক্ষ দেখবার ভয়।

তারপরে মনে হয়েছিল—এ পথে নয়। চেষ্টা করতে হবে অন্য দিক থেকে। আবেদন জানাবেন স্থূলতার কাছে। প্রার্থনা করে বললেন, তুমি পারো, ইচ্ছে করলেই পারো। তুমি একবার শক্ত হাতে ঘা দিলেই শুভোর মোহ যাবে ভেঙে—বুঝতে পারবে, তার মায়ের সংসারে সে ছাড়া আর কেউই নেই। জীবনের দীর্ঘ বাইশ বছর তাকে আশ্রয় করেই তার মা বেঁচে থেকেছে, আজ সেই অবলম্বন সরে গেলে—

সুযোগ এসেছে অনেকবার—ইচ্ছে করলেই বলা যেত। বলা যেত আজ দুপুরেই। কিন্তু সুলতার রৌদ্রতপ্ত ক্লান্ত মুখের দিকে তাকিয়ে সমস্ত মন একটা করুণ বেদনায় ভরে গেল। সুন্দরী মেয়ে, শান্ত গভীর দৃষ্টি, বিদুষী বুদ্ধিমতী। যদি স্বজাতি হত, কতদিন আগেই বধূরূপে বরণ করে আনতেন ঘরে, তুলে দিতেন সংসারের ভার, তারপর ছুটি নিয়ে জীবনের শেষ কটা দিনের জন্যে সেইখানে যেতেন—যেখানে অসির ক্ষীণধারা এসে মিশেছে অর্ধচন্দ্রাকৃতি নীলিম গঙ্গায়, যেখানে তুলসী ঘাটের শান্ত-নির্জনতার ওপর বটের ঘন ছায়া—যেখানে মন্দিরের উঁচু চত্বরের ওপর থেকে ভক্তকণ্ঠের আকুতি: 'রাম নাম কহো, রাম নাম কহো, জপো রাম কমল নয়ন'—

কিন্তু!

অসম্ভব। নিয়মের বিরুদ্ধে যেতে পারেন না গার্গী—যেতে পারেন না সংসারের বিরুদ্ধে, আচারের বিরুদ্ধে। সামনের দেওয়ালে অয়েলপেন্টিং থেকে দীনেশের শীতল দৃষ্টি। চাপা ঠোঁটে সেই কঠিন নিষেধ—সমস্ত মুখে দুর্লংঘ্য শাসন। অনেক দুঃখ তিনি দিয়েছেন স্বামীকে, প্রথম বয়সের উত্তেজনায় অহেতুক আঘাত করে সঞ্চয় করেছেন চরম অপরাধ। সে অপরাধের বোঝা আর তিনি বাড়াতে পারবেন না।

দীনেশ বেঁচে থাকলে কী হত কে জানে! হয়তো দীনেশ যতই বাধা দিত তিনি ততই দুর্বার হয়ে উঠতেন। নিষেধ যত প্রবল হয়ে উঠত, ততই তাকে ভাঙবার জন্যে ক্রুদ্ধ উন্মাদনা জেগে উঠত তাঁর মনে। কিন্তু মৃত্যুর মধ্য দিয়ে দীনেশ সম্পূর্ণ পরাস্ত করেছে তাঁকে; শেষ নিশ্বাস ফেলবার আগে দীনেশের সেই উদার ক্ষমা তাঁকে চূর্ণ করে দিয়েছে। জীবন্ত দীনেশ ছিল গার্গীর প্রতিদ্বন্দ্বী—আজ দেওয়ালের ওই ছবিখানাকে গার্গী ভয় করেন—ওই নিষ্পলক চোখের দৃষ্টি তাঁর ওপরে মেলে রাখে একটা কঠিন পাহারা।

না—অসম্ভব।

তবু শুভোর টেবিল গোছাতে গিয়ে পাওয়া গেল ছেঁড়া চিঠির টুকরোটা। লিখতে লিখতে কখন নিজেই থেমে গেছে শুভো, তাল পাকিয়ে ফেলে দিতে গিয়ে ফেলেছে ড্রয়ারেরই ভেতরে।

—'আমার সু, আমার কামনা'—

লাইন তিনেকের পরে আর পড়তে পারেননি। চশমার কাচ ঝাপসা হয়ে গেছে, না নিজের অজ্ঞাতেই চোখ বুজে এসেছে গার্গী টের পাননি। মুঠোর মধ্যে চিঠিটা নিয়ে চলে এসেছেন নিজের ঘরে।

সেই ঘর।

চারদিকে ভারী ভারী ফার্ণিচারের সেই শ্বাসরোধী স্তব্ধ জমাট ছায়া।

কেমন অদ্ভুত প্রেতকণ্ঠে ঘড়িটায় পাঁচটা বাজবার শব্দ।

আর—আর দেওয়ালে দীনেশের সেই ছবি। সেই চোখ। চাপা ঠোঁট। কপালের সেই চিন্তাজড়িত ভ্রূকুটির রেখাগুলো। ও'দিকের দেওয়ালে অন্নপূর্ণার লজ্জিত কোমল ছবিখানার দিকে তাকিয়ে আছে উগ্র-জিজ্ঞাসায়।

অসম্ভব। বসে পড়লেন গার্গী। মেজেটা টলছে পায়ের নিচে—দুলছে দেওয়াল। ব্লাড-প্রেশারের উত্তেজনা যেন হাঁফ ধরিয়ে আনছে বুকের মধ্যে।

সিঁড়িতে শোনা গেল জুতোর শব্দ। শুভো উঠে আসছে।

তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়ালেন গার্গী। আচ্ছন্ন অবশ শরীর যেন বৈদ্যুতিত হয়ে উঠল। বলবেন শুভোকে—বলবেন এই মুহূর্তেই? যেন শক্তি আর আশ্বাস পাওয়ার জন্যে দীনেশের ছবির দিকে তাকালেন তিনি। না—এখন নয়। আজকের এই প্রীতি-ভোজের আসরটিকে নষ্ট হতে দেওয়া যায় না। আজ আসুক সুলতা, শেষবারের মতো আসুক এ বাড়ীতে। চিরদিনের মতো যবনিকা টেনে দেওয়ার আগে মাত্র একটি সন্ধ্যায় ওদের কাছে আসতে দেবেন গার্গী। তারপর—

না, হৃদয়হীন তিনি নন।

দরজার গোড়ায় এসে দাঁড়িয়েছে শুভো। অভিভূত চোখ মেলে ছেলের দিকে তাকালেন গার্গী।

—রান্না কি সব হয়ে গেছে মা?—শুভো জিজ্ঞাসা করল: ওঁদের তাড়াতাড়ি আসতে বলে দিয়েছি। নিতান্ত ব্যবহারিক প্রশ্ন। শুভোর ক্লান্ত শুকনো মুখে যেন একখানা অজ্ঞাত বইয়ের অবোধ্য সূচীপত্র। অন্তর্গূঢ় মেঘের মতোই স্তব্ধ হয়ে আছে সে।

তেমনি মেঘমন্থর স্বরে গার্গী জবাব দিলেন: হাঁ, সবই তৈরী। এখন পোলাওটা চাপিয়ে দিলেই হয়ে যায়।

ধীরে ধীরে চলে গেল শুভো, এগিয়ে গেল পড়ার ঘরের দিকে। হাতের মুঠো খুলে তাল পাকানো ছিন্ন চিঠিটার দিকে একবার তাকালেন গার্গী। একখণ্ড অঙ্গারের মতো সেই হাতের মধ্যে জ্বলছে এখন।

*　　　*　　　*

রাস্তার দিকের বারান্দায় দাঁড়িয়ে অস্থিরভাবে ছটফট করছিল শুভো।

গলির মোড়ে মোড়ে মই কাঁধে গ্যাসওয়ালা এসে আলো জ্বেলে দিয়ে গেল—ইলেকট্রিক গুচ্ছগুলো দপ করে একরাশ ফুলের মতো ফুটে উঠল। সামনের বাড়ির তরুণী বধূটি অভ্যস্ত নিয়মে বৈকালী স্নান সেরে এসে রেলিঙে ঝুঁকে দাঁড়োলো—খুব সম্ভব অফিস-ফেরত স্বামীর প্রতীক্ষায়। কোথা থেকে একটি ছাত্র চিৎকার করে শুরু করলে পড়া:

"Tiger, tiger, burning bright,
In the forest of the night—"

কান পেতে পড়াটা শুনতে লাগল শুভো। নিজের মনের অরণ্যে সেও যেন একটা ক্ষুধিত বাঘের মতো পরিক্রমা করছে। সারাটা দিন একটা দুঃসহ যন্ত্রণায় পীড়িত হয়েছে সে—রক্তের মধ্যে জ্বলেছে বৈশাখের সূর্য; এখন আস্তে আস্তে ঘনাচ্ছে শীতল সন্ধ্যা—উত্তরের হাওয়ায় কলকাতার গোলাপী শীত শাদা ফাগের গুঁড়োর মতো লঘু কুয়াশায় পুঞ্জিত হচ্ছে। কিন্তু মনের উত্তাপ কিছুতেই কাটছে না—কিছুতেই নিভছে না গায়ের জ্বালা।

মা।

একমাত্র বাধা—একমাত্র নিষেধ! কিছুই নয়। ইচ্ছে করলেই সে

নিষেধ অগ্রাহ্য করতে পারে শুভো, বিদ্রোহ করতে পারে। কিন্তু সেই ইচ্ছে করাই যে কত কঠিন, মার সেই দুর্বল বাঁধনটুকুই কী দুশ্ছেদ্য—প্রতিদিন প্রতি মুহূর্তেই সে তা টের পেয়েছে।

স্নেহের অন্ত নেই মা'র। প্রশ্রয়ের রাশও তিনি টানেন নি যেখানে সেখানে। কখনো কখনো মনে হয়েছে—একটু দাবি, একটু জোর দেখালেই তাঁর কাছ থেকে সব কিছু আদায় করে নেওয়া চলে। কিন্তু পরক্ষণেই শুভো দেখেছে, কী কঠোর হয়ে উঠেছে মায়ের মুখের রেখা, কী ক্ষমাহীন ক্রোধ ঠিকরে পড়েছে তাঁর চোখ থেকে। সে জেনেছে, নিশ্চিত করেই জেনেছে : মা অকৃপণভাবে দিতে পারেন একথা যেমন সত্যি, তেমনি যখন তিনি মুঠো বন্ধ করেন, তখন সে বজ্রমুষ্টি খোলবার ক্ষমতা সংসারে কারোই নেই।

আজই সব কিছুর নিষ্পত্তি হয়ে যাবে। আজ সুলতা এলেই মিটে যাবে সমস্ত। বলা যায় না—হয়তো দেখা যাবে সবই মিথ্যে ; স্বামীর বিরুদ্ধে যে জোর নিয়ে মা একদিন দাঁড়িয়েছিলেন, সেই জোরেই অসংকোচে মেনে নেবেন সুলতা আর শুভোকে। আর যদি না নেন—

তা হলে ঝড়। সব বিপর্যস্ত হয়ে যাবে সে ঝড়ে। কোথায় কী ঠিকরে পড়বে তার সন্ধান পাওয়া যাবে না। হয়তো জীবনে আর দেখাও হবে না মার সংগে।

'Tiger, tiger, burning bright.'

ছেলেটা চিৎকার করে পড়ছে। শুভো একবার ঠোঁট কামড়ালো। বুকের মধ্যে একটা বন্য জন্তু সমানে আঁচড়ে চলেছে যেন। ওই বাঘটারই থাবা।

শুভো চমকে উঠল। বড় রাস্তা থেকে তাদেরই বাড়ির দিকে ঘুরল মস্ত মার্সেডিজ গাড়িখানা। 7575। মন্মথর গাড়ি—পরিচিত হর্ণের আওয়াজ।

নিশ্বাস বন্ধ করে নেমে গেল শুভো।

ওপর থেকেই গার্গীর গলা পাওয়া গেল : একি ঠাকুরপো—আপনি একা? সুরমা কোথায়, সুলতা কই?

সিঁড়ির ওপর থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো শুভো। রুদ্ধ হয়ে আসতে চাইল হৃৎপিণ্ডের গতি।

ততক্ষণে উঠে আসছেন মন্মথ। সামনের সিঁড়ির ওপরে ঠক করে নামালেন হাতের ছড়িটা। অপ্রতিভের মতো হেসে বললেন, ওদের পক্ষ থেকে আমি ক্ষমা চাইছি বৌদি। তিনজনের খাওয়াটা আমায় একাই খেয়ে যেতে হবে আজ।

সিঁড়ির মাথায় পাথর হয়ে শুভো দাঁড়িয়ে রইলো। মন্মথের পেছনে উঠে আসতে আসতে গার্গী বললেন, সে আবার কি রকম কথা? কী হল ওদের?

—ব্যাপার এমন কিছু না—মন্মথ কেমন অদ্ভুত ধরণে হাসলেন: চলুন ওপরে, বলছি।

দোতলায় এসে হলঘরের একটা সোফায় বসতে কতক্ষণ সময় নিলেন মন্মথ? দু মিনিট, তিন মিনিট, পাঁচ মিনিট? শুভো জানে না। মনে হতে লাগল, প্রতিটি মুহূর্ত এক একটা বৎসরের মধ্যে দীর্ঘায়িত হয়ে গেছে—এইটুকু সময়ের ভেতর পার হয়ে যাচ্ছে যুগ-যুগান্তর!

মন্মথ ধীরে সুস্থে বললেন, একটা গোলমাল হয়ে গেছে।

—কিসের গোলমাল?—উৎকণ্ঠায় আকুল শোনালো গার্গীর স্বর।

মন্মথ একবার ইতস্তত করলেন। লং কোটের পকেট থেকে বার করলেন একটা আধ-পোড়া হাভানা, ধীরে সুস্থে সেটাকে ধরালেন, তারপর:

—দুপুর বেলা কেমন যেন ফুড্‌পয়্‌জনের মত হল সুরমার। সারাদিন খুব কষ্ট পেয়েছে। তাই আসতে পারল না। লতাকেও রেখে আসতে হল ওর মার কাছে।

গার্গী বললেন, কী সর্বনাশ! এখন কেমন আছে?

—ভালো। ভয়ের কোনো কারণ নেই। আজকে প্রীতিভোজে আসতে পারল না সেইটেই সব চেয়ে দুঃখের বিষয়।

সঙ্কোচে গার্গী বললেন, অসুখের ওপর তো কারো হাত নেই। কিন্তু আমি নিজের হাতে করে এই সমস্ত খাবার দাবার তৈরী করলাম—

মন্মথ আবার হাসলেন। জোর করে টেনে আনা হাসি।

—সেজন্যে ভাববেন না, আমি সাধ্য মতো ম্যানেজ করতে চেষ্টা করব।—হাতের ঘড়িটার দিকে তাকালেন মন্মথ : বৌদি, আমাকে একটু তাড়াতাড়ি বিদায় করে দিতে হবে। জানেন তো, মনটা অত্যন্ত চঞ্চল।

—হাঁ, হাঁ, এখুনি ব্যবস্থা করছি—ব্যতিব্যস্ত হয়ে বেরিয়ে গেলেন গার্গী।

এতক্ষণে যেন সম্বিৎ ফিরে পেল শুভো।

—একবার কাকীমাকে দেখে আসতে চাই কাকাবাবু।

মন্মথর দুই চোখ সতর্কতায় সজাগ হয়ে উঠল : বেশ তো, যেয়ো কাল একবার।

—কাল নয়, এক্ষুণি।

—না, না, কিচ্ছু দরকার নেই—অত্যন্ত সন্ত্রস্ত মনে হল মন্মথকে : কাল গেলেই চলবে।

তাঁর গলার স্বরে এমন একটা কিছু ছিল যে শুভো থমকে গেল। মনে হল, সৌজন্যের খাতিরে বারণ করছেন না মন্মথ, পরোক্ষ ভাষায় জানাচ্ছেন একটা কঠিন নিষেধ।

সন্দেহে আর অস্বস্তিতে সমস্ত মস্তিষ্কটা যেন ফেটে পড়তে চাইল শুভোর : কিন্তু—

মন্মথ চোখ তুলে তাকালেন। গম্ভীর হয়ে উঠল তাঁর স্বর।

—আমি জানি। কী তুমি বলবে সে আমি বুঝতে পেরেছি শুভো। সেই জন্যেই তোমাকে অপেক্ষা করতে বলছি। তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে।

দু চোখে তীব্রতম বুভুক্ষা নিয়ে শুভো তাকিয়ে রইল। মন্মথ আস্তে আস্তে বললেন, ব্যস্ত হয়ো না—খাওয়ার পরেই বলছি সব।

শুভোর চোখে তেমনি আগুন জ্বলতে লাগল। দূর থেকে তেমনি ভেসে আসতে লাগল সেই ছেলেটার পড়ার আওয়াজ : **Tiger, tiger, burning bright—**

মন্মথ বলেছিলেন, তিনজনের খাওয়া তিনি একাই ম্যানেজ করবেন। কিন্তু যথাকালে দেখা গেল, নিজে যা খান, তার অর্ধেকও খেলেন না আজ, কোনোমতে যেন নিয়ম-রক্ষা করলেন। শুভো খেয়ে চলল যন্ত্রের মতো, পোলাও থেকে চাটনি পর্যন্ত প্রত্যেকটা জিনিসকে তার মনে হল সমান স্বাদহীন, সমান বিষাক্ত।

শুধু দুঃখ করে চললেন গার্গী।

—একি! কেউ কিছু খেল না—এত জিনিস সব যে নষ্ট হবে। শুভো, তুইও তো খাচ্ছিস না কিছু?

শুভো জবাব দিল না। কিছুক্ষণ পরে গার্গীও চুপ করে গেলেন। এই দু জনের নিস্তব্ধতা তাঁকেও এসে স্পর্শ করল, তাঁরও মনের মধ্যে ঘনিয়ে এল মেঘচ্ছায়া। মনে পড়ে গেল চিঠিটার কথা, মনে পড়ে গেল সংশয়াকীর্ণ তীব্র অন্তর্দাহের কথা। একটা বজ্রগর্ভ ঝড় গুমোট হয়ে রইল ঘরের ভেতরে।

চাকরটা টেবিল পরিষ্কার করে নিয়ে যাওয়ার পরে মন্মথ আবার চুরুট ধরালেন। ভেঙে দিলেন স্তব্ধ সম্ভাবনার আবরণ।

—মাপ করবেন বৌদি। প্রীতিভোজটা নষ্ট করতে চাইনি বলেই কয়েকটা মিথ্যে কথা বলতে বাধ্য হয়েছি: যেন প্রীতিভোজটা নষ্ট হওয়ার এর পরেও বাকী ছিল কিছু। কিন্তু মা আর ছেলে কেউ কোন জবাব দিলেন না। শক্ত হাতে টেনে ধরা ধনুকের ছিলার মতো উৎকণ্ঠিত তীক্ষ্ণ অপেক্ষায় তাকিয়ে রইলেন দু'জন।

অ্যাড্‌ভোকেটের শীতল অনাসক্ত ভঙ্গিতে মন্মথ বললেন, আপনি নিশ্চয়ই জানেন বৌদি, তবু একটু ভূমিকা করা দরকার।—দু' জনের মুখের ওপর নিজের ব্যথিত দৃষ্টি বুলিয়ে নিলেন তিনি: শুভো আর সুলতার মধ্যে এমন একটা সম্বন্ধ সৃষ্টি হচ্ছিল যা আপনি চান না—আর সেই কারণে আমিও চাইতে পারি না।

তার ওপর সুলতার যে কাজকর্ম তার সঙ্গে আমার মত কিছুতেই মিলছিল না। তাই আই হ্যাড্‌ এ লং ডিসকাসন উইথ হার অ্যাণ্ড ফাইন্যালি—

—অ্যাণ্ড্ ফাইন্যালি?—শুভো প্রশ্ন করল না, গার্গীও না। কিন্তু দুজনের চোখেই খরধার প্রতীক্ষা জ্বলতে লাগল দুটো জ্বলন্ত জিজ্ঞাসা-চিহ্নের মতো।

মন্মথ বললেন, একটু গোলমালই হলো বাড়িতে। শেষ পর্যন্ত সুলতাই পথ বেছে নিলে। আমার বাড়ি থেকে সে চলে গেছে। মানিকতলায় কোথায় ওর কয়েকটি বন্ধুর একটা আস্তানা আছে—সেখানেই সে শিফ্‌ট করেছে। আর আমাকে অনুরোধ করেছে এই কথাই জানাতে যে, শুভো যেন কখনো তার সঙ্গে আর দেখা না করে।

সংক্ষিপ্ত কাহিনী আরো সংক্ষেপেই শেষ করলেন মন্মথ। তাঁর শান্ত-সংযত মুখেও তীক্ষ্ণ বেদনার চিহ্নটা গোপন রইল না। তারপর আবার কিছুক্ষণ ঘরের মধ্যে সেই নৈঃশব্দ। আবার কয়েকটা মুহূর্তের বিলম্বিত লয়ে যুগ-যুগান্তের অতিক্রমা:

তারপর উঠে দাঁড়ালো শুভো। যেন জেগে উঠল দুঃস্বপ্ন থেকে।

—আমি যাচ্ছি।

বিদ্যুতের চমক খাওয়ার মতো এতক্ষণে নড়ে উঠলেন গার্গী। থর থর করে কেঁপে উঠল শরীর।

—কোথায় যাচ্ছ?

মায়ের দু চোখের দিকে তাকিয়ে মুহূর্তে সব স্পষ্ট হয়ে গেল শুভোর। সেই কঠিন নিষ্ঠুর চোখ—সেই ক্ষমাহীন নির্মমতা। কিন্তু আজ আর বশ মানল না শুভো।

—মানিকতলা।

—না।—গার্গী হঠাৎ চীৎকার করে উঠলেন: না, না!—পাঁচ বছরের সঞ্চিত বিস্ফোরকে আগুন লেগে বিদীর্ণ হয়ে পড়ল।

শুভো দরজার দিকে অগ্রসর হল: আমাকে যেতেই হবে মা। ফিরিয়ে আনতেই হবে সুলতাকে।

পথ আড়াল করে দাঁড়াতে যাচ্ছিলেন গার্গী—হঠাৎ হাত সরিয়ে নিলেন।

ক্ষিপ্ত স্বরে বললেন, যেতে চাও, যাও! কিন্তু মনে রেখো, সুলতাকে ফিরিয়ে আনলে এ বাড়িতে আর তোমার ফেরবার পথ থাকবে না।

—তা জানি। জেনেই যাচ্ছি—চলতে চলতেই জবাব দিল শুভো। একবার ফিরে দাঁড়ালো না, একবার তাকালো না গার্গীর মুখের দিকে—একটা জলন্ত হাউইয়ের মতো সিঁড়ি দিয়ে ছিটকে পড়ল নীচের দিকে।

উত্তেজনায় থর-থর করে কাঁপতে কাঁপতে একটা সোফায় বসে পড়লেন গার্গী। আর একটি কথাও বলতে পারলেন না—গলার স্বর তাঁর রুদ্ধ হয়ে গেছে।

আবার প্রলম্বিত মুহূর্তের সারি। আবার যুগ-যুগান্তর তার মধ্য দিয়ে অতিক্রান্ত হয়ে যাওয়ার পালা।

একটা গলা-খাঁকারি দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন মন্মথ। এই নাটকের বিকম্ভক।

—আমি তবে চলি বৌদি। রাত হয়ে গেছে।

সতেরো

সুলতা বললে, এত তাড়াতাড়ি তুমি ছুটে আসবে আমি ভাবতে পারিনি।

শুভো কপালের ঘাম মুছল একবার। ব্যারাকের মতো চাপাচাপি তিনখানা এই একতলা ঘরের বাড়িতে কোথাও আতিশয্য নেই একটুও। না আলো-হাওয়ার, না প্রয়োজনের। ছাতটা মাথার ওপর ঝুলে নেমেছে অনেকখানি—কাঠের বরগাগুলোর চেহারা দেখে মনে হয় রন্ধ্রে রন্ধ্রে ঘুণ—যে-কোনো সময় ধ্বসে পড়তে পারে। বহুকাল আগে চুণকাম হয়েছিল—এখন লাল-সবুজ শ্যাওলা স্যাঁৎস্যাঁৎ করছে দেওয়ালে। এখানে একটি ঘরে তিনটি তক্তপোষ, তিনটি সংক্ষিপ্ত শয্যা। তাদের একটিতে একটি মেয়ে নিবিষ্ট চিত্তে কী লিখে চলেছে—শুভো ঘরে ঢোকবার পরে সেই যে মুহূর্তের জন্যে চোখ তুলেছিল, তারপরে ফিরেও তাকায়নি আর। আর একটি বিছানা খালি—তার মালিক এখনো ফেরেনি।

দম-চাপা ঘর। বাইরের হাওয়া আসে না—একটা ফ্যানের কল্পনা করাও এখানে অবান্তর। কত সংক্ষিপ্ত করা যায় প্রয়োজনকে—এ যেন তারি পরীক্ষা।

সুলতা আবার বললে, ঠিকানা পেলে কী করে?

—কাকিমা দিয়েছেন। অন্তত এ-টুকু দয়া করেছেন আমাকে।—শুভো আর একবার কপালটা মুছে নিল : কিন্তু এখানে না এলেই কি তোমার চলতো না লতা?

—হয়তো আরো কিছুদিন চলত, কিন্তু বেশিদিন চলত না। বাবার স্নেহটাকে একটা তিক্ত সংঘর্ষের মধ্যে টেনে আনার আগে এইটেই তো ভালো হল শুভো।

—তারপর?

—একটা স্কুলে চাকরির চেষ্টা করছি, হয়তো হয়ে যাবে আসছে মাস থেকেই। আর যে ক'দিন না হয়—এরা সব রয়েছে, অসুবিধে হবে না। এ' ঘরে আমার দুটি বন্ধুই নার্স, কাজেই—সুলতা হাসল : ওদের নার্সিংয়ের ওপরেই কিছুদিন কাটিয়ে দিতে পারব।

এক পাশের দেওয়ালে দুটো বড় বড় পোস্টার। মেহনতী মানুষের সংগ্রাম আর শান্তির দুটি ছবি। শুভো কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল সেদিকেই। হঠাৎ এই মুহূর্তে যেন তার মনে হল, সুলতাকে তার পরিপূর্ণ দেখাটা বাকী থেকে গিয়েছিল। সুলতাকে অনেকখানি সে পেয়েছে, কিন্তু তারও বেশি অনেকটাই তার পাওয়া হয় নি। এই বাড়ি—ওই পোস্টার, নিঃশব্দে লিখে চলা, চাপা ঠোঁটের ওই আশ্চর্য নিরাসক্ত মেয়েটি—এদের সকলের ভেতরে এসে সুলতা এমনভাবে স্বতন্ত্র হয়ে যায়—কে বুঝতে পেরেছিল সে-কথা!

অস্বীকার করার উপায় নেই—শুভোর সমস্ত আবেগটা হঠাৎ এসে হোঁচট খেয়েছে এক জায়গায়। যেন ধাক্কা খেয়েছে ঠাণ্ডা একটা অতিকায় দেওয়ালে।

তবু শুভো বললে, ফিরে চলো লতা।

—তোমার বাড়িতে ?

—না।

—তা হলে ?

তা হলে—চট্ করে শুভো এ কথার জবাব দিতে পারল না। আজ রাত্রে—এই মুহূর্তেই ? কোথায় নিয়ে যাবে লতাকে ? নিজের বাড়িতে ফেরবার পথ সে বন্ধ করে এসেছে। মা-র ক্ষমা কবে পাওয়া যাবে অথবা কোনোদিনই পাওয়া যাবে কিনা তার উত্তর শুভোর জানা নেই। যে বাড়ি সুলতা ছেড়ে এসেছে সেখানে সে ফিরে যাবে না—শুভোর প্রশ্ন ওঠেই না। তা হলে কোনো হোটেলে ? ছিঃ—ছিঃ—এই রাত্রে ? সামাজিক সম্বন্ধের স্বীকৃতি না নিয়েই ? এ রকম প্রস্তাব তোলবার সঙ্গে সঙ্গেই সুলতার আত্ম-সম্মান খড়্গের মতো নেমে আসবে। না—সে কথা বলা যায় না।

সুলতা নিজেই কি বুঝল ওর কথা ?

—শুভো, আজ তুমি ফিরে যাও।

—ফিরে যাব ?—শুভো শূন্য দৃষ্টিতে তাকালো। মাথার ওপরে ঝুলে পড়া ছাদ। শ্যাওলার এলোমেলো কার্টুন। কী অদ্ভুত গরম এই ঘরটা !

—সেই ভালো হবে। আজ রাতটা তুমি ভাবো। শুধু আজ রাতই বা কেন ? কাল—পরশু—যতদিন তোমার খুশি। আমি আছি—তুমিও আছো। কিন্তু কয়েক মুহূর্তের খাপছাড়া মাতলামি দিয়ে দুজনের থাকাটাকেই একেবারে মিথ্যে করে দিয়ো না।

কিন্তু কোথায় ফিরে যাবে শুভো ? যে বাড়ি ছেড়ে চলে এসেছে ঝড়ের মতো, আবার সেখানে কি ফিরে যাওয়া চলে ? আর ফিরেই যদি যায়—এখানে আসবার কোনো কি উপায় থাকবে তার ? এখন মায়ের সামনে গিয়ে দাঁড়ানোর একটি মাত্রই অর্থ আছে। সে পরাজয়—সে আত্মসমর্পণ।

সুলতা নিজের হাতঘড়িটার দিকে তাকাল।

শুভো, রাত সাড়ে দশটা বেজে গেছে। এরপরে আর তোমার থাকা উচিত নয়।

—আমি যাব না।

সুলতার কপালে ক্লান্তির ছায়া ঘনিয়ে এল। একবার আড় চোখে তাকিয়ে দেখল ও পাশের মেয়েটির দিকে। নিজের মনে একটানা সে লিখে চলেছে—যেন একটি বর্ণও শুনতে পাচ্ছে না। তবু—

সুলতা বললে, বেশ, তবে বাইরে চলো। একটু খোলা হাওয়ায় দাঁড়ানো যাক বরং।

শুভো চমকে উঠল।

—তুমি কি পরোক্ষ ভাষায় আমাকে বেরিয়ে যেতে বলছ লতা?

বিষণ্ণ ক্লান্তিতে সুলতা বললে, তোমাকে কোনো কথা বলতে আমার পরোক্ষের দরকার নেই! যা বলবার আমি স্পষ্ট ভাষাতেই বলতে পারি। জিনিসটা তা নয়। চলো না—খোলা হাওয়ায় দাঁড়াই একটু।

শুভো আপত্তি করল না। উঠে দাঁড়ালো। হয়তো এতক্ষণে তারও খেয়াল হল, সামনে তৃতীয় পক্ষ রয়েছে আর একজন। তার সামনে খানিকটা সংযত হয়ে চলাই দরকার।

বাইরে আর কোথাও নয়—একেবারে রাস্তার পাশেই। অপরিচ্ছন্ন পুরোনো বাড়ি আর খোলার ঘর ইতস্তত। অলক্ষ্মী-লাগা আবছা অন্ধকার—গ্যাসের ক্লান্ত আলো। কোথাও একটা খাটাল আছে কাছাকাছি—হাওয়ার হাওয়ায় আছড়ে পড়ছে তার দুর্গন্ধ।

কিছুক্ষণ চুপ করে রইল শুভো। কথার সূত্র খুঁজছে। তারপর:

—আমি বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসেছি তোমাকে পাওয়ার জন্যে। তুমি তো আমার জন্যে বেরিয়ে আসোনি সু।

—না।

অত্যন্ত স্পষ্ট সহজ গলায় জবাব দিলে সুলতা। একটা ভোঁতা জিনিসের আঘাত যেন শুভোর মুখে এসে পড়ল।

—সত্য!

—আজ আমার নিষ্ঠুর না হয়ে উপায় নেই শুভো। একটা মিথ্যে কথাও আমি আজ বানিয়ে বলতে পারব না। এখানে চলে এসেছি দুটো কারণে। প্রথমত—যতই দিন যেত, ততই বাবা-মার সঙ্গে আমার বিরোধ অনিবার্য হয়ে উঠত। ওঁদের স্নেহ যতটা ভর সয়, তার মাত্রা ছাড়িয়ে যাওয়ার আগেই ওঁদের আমি ছেড়ে এসেছি। ব্যথা দিয়েছি, কিন্তু সেই সঙ্গে আঘাত দেওয়ার দায়টাকেও এড়িয়ে গেলাম।

সুলতা থামল।

—আর দ্বিতীয় কারণ?—শুভো প্রশ্ন করল।

—ওটা নাই বা শুনলে।

—শুনতেই হবে আমাকে।—শুভো দাঁতে দাঁত চাপল।

—যদি বলি তোমার হাত থেকে বাঁচবার জন্যে?

—অবিশ্বাস করব না।—একটা দানবিক শক্তিতে আত্মস্থ হতে চাইল শুভো: কিন্তু আমার হাতটা অনেক বেশি নিষ্ঠুর সুলতা। সে কোথাও তোমাকে ছাড়বে না। সারা পৃথিবী তোমার পেছনে পেছনে রাহুর মতো ঘুরে বেড়াবে।

—বেশ, না হয় আমি ধরাই দিলাম। কিন্তু শুধু আমাকে পেলেই তো চলবে না শুভো। আমার সঙ্গে আরো অনেক কিছু নিতে হবে তোমাকে। হয়তো তোমার ঘরের শান্তি আমি রাখতে পারব না, হয়তো বাইরের ডাক বার বার তোমার কাছ থেকে আমাকে আলাদা করে দেবে।

—জানি।

—তবু আজ নতুন করে শোনো। অ্যাডভোকেট এম-এন দাশগুপ্তের বাড়িতে এ-কথাগুলো শুনতে মন্দ লাগেনি—বেশ বৈচিত্র্যের স্বাদ এনে দিয়েছে একটা। কিন্তু এ শুধু মুখ বদলানো নয় শুভো, জীবন-বদলানো। এখন কথাগুলো আর একটুখানি আমেজ সৃষ্টি করেই হাওয়ায় মিলিয়ে যাবে না—প্রত্যেকদিন কঠিন বস্তুর রূপ নিয়ে আঘাত করবে। মোটরের মসৃণ গতি নয়—

নুড়ির হোঁচট লাগবে পায়ে পায়ে। সেই সত্যকে বোঝো শুভো—সেই নতুন পরিবেশের মধ্যে ভাখো আমাকে।

—দেখেছি।

—এর চেয়ে ঢের ভালো মা—ঢের ভালো তাঁর আশ্রয়। না-না, আমি তোমায় কাপুরুষ বলছি না। ভালো ছাত্র তুমি—স্কলার। তোমারও কত কাজ আছে। কৃতি অধ্যাপক হও—তোমার দাদুর মতো ছাত্র তৈরী করো—সে কাজ আমার চাইতে ঢের বড়: আমাকে নিয়ে তোমার লাভ নেই শুভো। তুমি আমাকে হারাবে—নিজেকেও হারাবে। তার চেয়ে দূরে দূরে থাকাই তো ভালো। দুজনে একসঙ্গে পিছিয়ে পড়ার চাইতে আলাদা হয়ে এগিয়ে চলাতেই তো লাভ বেশি।

একটা তীব্র উত্তর দিতে চাইল শুভো। কিন্তু মনের মধ্যে সমস্ত কথাগুলোই এসে জমেছে একরাশ পুঞ্জিত বাষ্পের মতো। তারা বিদীর্ণ হয়ে বেরিয়ে পড়তে চাইছে—কিন্তু তাদের না আছে রূপ, না আছে আয়তন। অনেক কথা—অনেকগুলো কথা শুভো একসঙ্গে বলতে চাইল। কিন্তু ঠোঁটটা নড়ল না পর্যন্ত।

নির্জন রাস্তার ওপর দিয়ে লঘুছন্দে কে একজন এগিয়ে আসছিল। ঠিক বাড়িটার সামনে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল একবার। নিশ্চিন্তভাবে একটা সিগারেট ধরালো, আবার হেঁটে চলল ধীরে ধীরে।

সুলতা মৃদু হাসল।

সমস্ত সঞ্চিত উত্তাপগুলো একটা বিকৃত জিজ্ঞাসায় শুভোর গলা দিয়ে বেরিয়ে এল: হাসলে যে?

—জানো, কে ওই লোকটা?

—না।

—ওয়াচার।

ওয়াচার? কথাটা খট করে কানে এসে লাগল।

—কী চায় ও?

—আরো ব্যাখ্যা করে কি বোঝাতে হবে? এ বাড়িটা ওরা পছন্দ করে না। এর পরে আমাকে করবে না এবং আরো পরে তোমাকেও নয়।

—ইচ্ছে করছে লোকটার গলা টিপে ধরি।

এবার শব্দ করে হেসে উঠল সুলতা।

—তার সঙ্গে নিজের গলা টিপে ধরার কোনো তফাৎ নেই। রাগ করে পাথরে কিল মেরে কী হবে শুভো? আমাকে নিতে চাইলে ওদেরও নিতে হবে—অনেক বেশিই নিতে হবে আরো। তাই বলছিলাম, ফিরেই যাও।

রেসের ঘোড়ার মতো ছুটতে ছুটতে যেন হঠাৎ থমকে গেছে শুভো। যেন পথ আটকে গেছে একটা খাদের সামনে। যদি লাফিয়ে পার হয়ে যেতে না পারে—সামনে অতল।

শুভো বললে, বেশ, কাল সকালে আমি আসব।

—না, সকালে নয়।—সুলতা আস্তে আস্তে বললে, বেলা সাড়ে আটটার পরে আমি বেরিয়ে যাব। ফিরতে হয়তো দেরি হবে দিন তিনেক।

—কোথায় যাবে?

—কী করবে শুনে?—সুলতার স্বর করুণায় ভরে উঠতে লাগল: কলকাতা থেকে মাইল ত্রিশেক দূরে।

—বেশ, আমি যাব সঙ্গে।

—এত কথার পরেও পাগলামি করছ শুভো? সেখানে তোমার কোনো কাজ নেই। আমি যাব হিরণ সেনের সঙ্গে। আরো দু চার জনও থাকবে।

—হিরণ সেন।—একটা কাতরোক্তি যেন বেরিয়ে এল শুভোর গলা দিয়ে।

—তাঁর নাম কি তুমি শোনোনি শুভো? তাঁর ছবি কি তুমি কখনো দেখোনি কাগজে?

শুনেছে বই কি। বাংলা দেশে যারা দু পাতাও খবরের কাগজ পড়ে তারাই জানে ও নাম। অ্যাসেম্‌ব্লিতে হিরণ সেনের বক্তৃতা অনেক চাঞ্চল্যই সৃষ্টি করেছে অনেকবার।

বিবর্ণ মুখে শুভো বললে, শুনেছি।

সুলতা বললে, তাঁর সঙ্গেই আমায় যেতে হবে। কিন্তু আজ আর এ-সব আলোচনা থাক শুভো। তুমিও ক্লান্ত, আমিও ক্লান্ত। রাত এগারোটা বাজে। এবার তুমি এসো। বাড়ী চলে যাও—সময় নাও—নিজেকে বিচার করে দেখো ভালো করে। ভেবে দেখো, আমার জন্যে যতটা দাম তুমি দিতে চাইছ, আমি ততখানি অপচয়ের যোগ্য কিনা।

শুভো একবার শূন্য চোখে তাকালো। আবছায়া গলায় বললে, বেশ, তাই হবে।

তারপরেই আর দাঁড়ালো না সুলতা। সঙ্গে সঙ্গে প্রায় ছায়াবাজীর মতো মিলিয়ে গেল সামনে থেকে।

আস্তে আস্তে হাঁটতে লাগল শুভো। রাত এগারোটা। অলক্ষ্মী অন্ধকার চারদিকে। খাটালের উগ্র গন্ধ। কয়েকটা ক্লান্ত গ্যাস। মাথার ওপর সার বাঁধা বিবর্ণ তারা।

কোথায় যাবে ?

না—বাড়িতে নয়। নিজের সঙ্গে শেষ বোঝা-পড়া না হওয়া পর্যন্ত তার সেখানে গিয়ে দাঁড়ানো চলে না। সেখানে ফিরে যাওয়া অর্থ-ই সব কিছুর সমাধান। আর—একটি মাত্র সমাধান।

তা হলে ?

নিজের চারদিকে চেয়ে দেখল একবার। একটু দূরেই খালের পঙ্কিল জল। ভাঁটার টানে বিষাক্ত সাপের মতো কিলবিল করে চলেছে। একটা ভাঙা বজরা পড়ে আছে ডাঙার ওপরে।

কী মনে হল শুভোর কে জানে। কোথাও যাবে না—কোথাও না। আজ একটা রাত সে নিজের মুখোমুখি। একটা রাত নিজেকে সে যাচাই করে দেখবে। সুলতার এই বাড়ি—ওই ওয়াচার—সর্বোপরি হিরণ সেন—

শুভো এগিয়ে এল বজরাটার দিকে। ক্লান্ত—বড় ক্লান্ত। দু পা বাড়িয়ে তার ওপর উঠে পড়ল—তারপর লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ল একরাশ ধরথরে পচা কাঠের ওপর।

সামনে অন্ধকার খালের জলে মরা কুকুর বা অমনি কিছু একটা ভেসে চলেছে। কেমন যেন হিংস্র থলথল আওয়াজ। মশারা দল বেঁধে এসে ছেঁকে ধরেছে তাকে।

পরীক্ষা হোক—একটা রাত দাঁড়াক সে শক্তি আর পৌরুষের মুখোমুখি। ঝোঁকের মাথায় নয়—জেদের তাগিদে নয়—একটা বিপর্যয় কিছু করবার উগ্র উন্মাদনায় নয়। ঠিকই বলেছে সুলতা। তাকে নিতে হলে আরো অনেক কিছু নিতে হবে। অনেক—অনেক বেশি। কিন্তু! শুভো কি নিতে পারে অতখানি? অত বড় শক্তি কি আছে তার?

বাবা এক জায়গায় থেমে গিয়েছিলেন। আর একটা সীমান্তে এসে মা-ও দাঁড়িয়ে পড়লেন। শুভোও কি তবে এসে দাঁড়ালো তার বৃত্তরেখার সামনে?

ওয়াচার। হিরণ সেন। আরো—আরো—আরো—

এই একটিমাত্র রাত তার সামনে পড়ে আছে। এই রাতেই তার সব কিছু আত্ম নিরীক্ষা শেষ হয়ে যাবে। সুলতাকে যা বলবার—তা বলতে হবে বেলা আটটা বাজবার আগেই।

বজরার পচা কাঠের ওপর তেমনি পড়ে রইলো শুভো। অন্ধকারে দুটো চোখ প্রহর জাগতে লাগল। এই খালের জল—এই রাত—। চারদিকে যেন অসংখ্য জিজ্ঞাসা-চিহ্ন একরাশ জ্যোতির্ময় পতঙ্গের মতো পরিক্রমা করতে লাগল তাকে।

রাত বাড়তে লাগল।

আরো রাত। আরো রাত। অন্ধকারে চলন্ত নক্ষত্রের অশ্রান্ত গতির সঙ্গে ছুটে চলল রাত্রির প্রহর। গলির মোড়ে মোড়ে গ্যাস ম্লান হতে লাগল। নির্জন পথের ওপর কুয়াশা এসে ঘন হয়ে ঘিরতে লাগল ইলেক্‌ট্রিক গুচ্ছকে। গার্গী এসে জানালার সামনে দাঁড়ালেন। সামনে অন্ধকার গঙ্গা। কাশীর নীলধারা পঙ্কিলতায় আকীর্ণ। শৃঙ্খলে বাঁধা তিমিরাবগুণ্ঠিত বয়াটার গায়ের জলের আর্ত কাকুতি।

ওই শৃঙ্খলিত বয়াটার মতোই এখানে বন্দিনী গার্গী। তাঁর মুক্তি নেই—মুক্তি নেই এ বাড়ির নিষ্ঠুর বন্ধন থেকে।

সশব্দে জানালাটা বন্ধ করে দিলেন। একবার মনে হল, তিনিও কাল ছুটে যাবেন সুলতার কাছে—বধূরূপে তাকে ফিরিয়ে আনবেন ঘরে। বলবেন, এ সব দেশাচার লোকাচার সব মিথ্যে, এর কিছুই আমি মানি না—কিছুই আমি স্বীকার করি না—

হয়তো স্বগতোক্তিটা চিৎকার করেই বলে ফেলতেন গার্গী, কিন্তু পারলেন না। তার আগেই মুখর হয়ে উঠল ঘড়িটা। প্রেতকণ্ঠে একটা বিষাক্ত ব্যঙ্গোক্তির মতো সেটা ঘর ঘর করে উঠল, তারপরে তীক্ষ্ণধ্বনিতে বাজতে লাগল : ঠং—ঠং—ঠং—

—মানি না, আমি মানি না—ঘড়ির আওয়াজ ছাপিয়ে আর্তনাদ তুলতে গিয়েই বিস্ফারিত চোখে থেমে গেলেন গার্গী! দেওয়ালে দীনেশের সেই শীতল নিষ্পলক দৃষ্টি। তারপর আস্তে আস্তে দীনেশের ছবির মধ্যে থেকে যেন দুখানা হাত বেরিয়ে এল—এগিয়ে এল তাঁর দিকে—দুটো কঠিন থাবায় তাঁর গলাটা টিপে ধরতে লাগল।

কণ্ঠের ওপর অশরীরী হাতের সেই নির্মম স্পর্শ অনুভব করতে করতে চৈতন্য হারিয়ে গার্গী হিমার্ত মেজের ওপরে লুটিয়ে পড়লেন॥